মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

মে ২০২৬
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ ১৪৪৭
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০৮

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন ॥ ৫
দারসুল হাদীস ॥ ১৩
চিন্তাধারা
হজ্জের বিশ্ব সম্মেলন
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ॥ ১৯
মতামত
রামমোহন আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা
সংকটে আমাদের সংস্কৃতি, রাজনীতিও
আবুল আসাদ ॥ ২৭
জীবনকথা
ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া (রহ)
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী ॥ ৩৫
চিন্তাধারা
কৃত্রিম সংকট তৈরির ক্ষতিকর প্রভাব :
ইসলামের আলোকে পর্যালোচনা
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৪৩
আন্তর্জাতিক
ইরানে ইসরায়েল-মার্কিন যৌথ হামলা
মীযানুল করিম ॥ ৪৯
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৭

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :
সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

'ঈদুল আযহা বা কুরবানীর 'ঈদ ত্যাগের অনুপম অনুশীলনের এক স্মরণীয় নাম। আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে নিজেকে আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেওয়ার এক প্রতীকী মহড়ার নাম 'ঈদুল আযহা। আযহা বা কুরবানীর মর্মকথা হলো নিজের সবকিছু- এমনকি প্রয়োজন হলে নিজের জীবনটাও আল্লাহর জন্য নিবেদন করা। মোট কথা একান্তভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সপে দেওয়া বা আল্লাহর কাছে নি:শর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা।

কুরবানীর ইতিহাসের সাথে যাঁর নাম জড়িত তিনি হলেন, মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আ)। আল কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তার প্রভু তাকে বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ কর। তিনি বললেন, আমি জগতসমূহের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'

একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কুরবানীগুলো কি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ) এর সুন্নাত।

ইবরাহীম (আ) ছিলেন শিরকের বিরুদ্ধে এক আপোসহীন সংগ্রামী পুরুষ। শিরক নির্মুল করে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত। তিনি শিরকপূর্ণ সমাজে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আমি আমার নিজেকে সবদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিবিষ্ট করলাম, যিনি আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৬ : আল আন'আম, আয়াত-৭৯)

তিনি আরো ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ জগতসমূহের প্রভু আল্লাহর জন্য।" (৬ : সূরা আল আন'আম, আয়াত-১৬২)

কুরবানীর সময় দু'আ হিসেবে এ আয়াত দু'টি পাঠ করা হয়। এর মাধ্যমে মূলত: শিরক মুক্ত হয়ে তাওহীদের ঘোষণা প্রদান করা হয়, যার অর্থ হলো নযর, মান্নত, কুরবানী, 'ইবাদাত বন্দেগী শুধুমাত্র আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর জন্যই করতে হবে, অন্য কারো জন্য করা যাবে না।

প্রাচীনকাল থেকেই পৌত্তলিকরা বিভিন্ন দেবদেবী, মূর্তি, গাছ, পাথর, আগুন, চন্দ্র, সূর্য, তারকা প্রভৃতির পূজা এবং তাদের নামে এবং তাদের জন্য নযর, মান্নত, কুরবানী প্রভৃতি করে আসছে। বর্তমানে এক শ্রেণীর মুসলিমও কিছু ব্যক্তির কবরকে মাযারে পরিণত করে সেখানে গরু, ছাগল, টাকা-পয়সা,

খাবার প্রভৃতি মান্নত করছে যা সুস্পষ্ট শিরক। এধরনের সকল শিরক থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সবকিছু করা ও নিবেদন করাই হলো ইবরাহীম (আ) প্রবর্তিত কুরবানীর মূল শিক্ষা।

কুরবানীর মূল চেতনা হলো আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন বা বিলিয়ে দেওয়ার চেতনাবোধ। এজন্য নিজের প্রিয় বস্তু, প্রিয়জন এমনকি নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হলে, অকাতরে তাও বিলিয়ে দিতে হবে। এ চেতনাবোধ ও এজন্য বাস্তব জীবনে তা প্রতিপালনে সদা প্রস্তুত থাকা, কোন বিপদাপদ বা বাধা প্রতিবন্ধকতায় দমিত না হয়ে তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অটল অবিচল থাকাই কুরবানীর মূল শিক্ষা। এ শিক্ষা গ্রহণ না করে গরু-ছাগল যবেহ করে গোশত খেলে কুরবানীর প্রকৃত ফায়দা হাসিল হবে না। বরং কুরবানী দেওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর হুকুমেই সে তার মূল্যবান পশুটি কুরবানী করছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর অন্যান্য সকল হুকুমও প্রতিপালন করতে হবে, প্রয়োজনে নিজের জান কুরবান করে হলেও।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর গোশত এবং রক্ত কোনটিই আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে শুধুমাত্র তোমাদের তাকওয়া (আল্লাহভীতি)।' (২২ঃ আল হাজ্জ, আয়াত-৩৭) সুতরাং শুধু পশুকে নয়, মনের পশু সত্ত্বাকেও কুরবানী করতে হবে। যাতে মন একান্তভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর দীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার দ্বারাই তা অর্জিত হতে পারে।

কুরবানীর গোশতের ক্ষেত্রেও সংযম ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিজে কম খেয়ে অন্যদেরকে, বিশেষ করে গরীব-দুঃখী মানুষকে বেশী করে দান করা প্রয়োজন। সামর্থবান ব্যক্তিদের উপর কুরবানী আবশ্যক। এ ধরনের ব্যক্তিরা সারা বছর গোশত কিনে খেতে পারে। এজন্য কুরবানীর গোশতে সে সব মানুষকে শামিল করা প্রয়োজন, যাদের গোশত কিনে খাওয়ার সামর্থ নেই। তাদেরকে বঞ্চিত রেখে নিজের ভোগ-সম্ভোগকে বৃদ্ধি করা কুরবানীর শিক্ষার সাথে মানানসই নয়। ■

আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}

অনুবাদঃ 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়; যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে পরম আনন্দ', [আর– রা'দ– ১৩: ২৮– ২৯]।

নামকরণঃ সূরাটির ১৩ নং আয়াতে উল্লেখিত 'আর– রা'দ' শব্দটি দ্বারাই এর নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, {وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} 'আর 'আর– রা'দ তাঁর প্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশ্তাগণও তা–ই করে তাঁর ভয়ে'।

নাযিলের সময় ঃ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ রাসূলের নিকট নিদর্শন দাবী করেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ}

'আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?', [আর–রা'দ– ১৩: ২৭]। ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, তাদের দাবীগুলোর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের কাছে ওহী পাঠালেন যে, আপনি চাইলে, আমি তাদেরকে তা প্রদান করব। কিন্তু এরপরও যদি তারা কুফরী করে তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দেব যে, তা আর কাউকে কোনদিন দেইনি। আর আপনি যদি চান যে আমি রহমাত ও তাওবার দরজা খুলে দেই তাহলে তাই দেব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদের জন্য রাহমাত ও তাওবার দরজা খোলা হোক, [মুসনাদ আহমাদ ১/২৪২, নং ২১৬৬, তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৪৫৪]। কিন্তু কোন নিদর্শন ছাড়াই যারা ঈমান আনে এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহর বাণী, {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ}'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়'; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও একত্ববাদের জ্ঞান লাভ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন এনেছেন

তা সত্য বলে জানার মাধ্যমে ঈমানদার ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রশস্ত হৃদয়ে, প্রশান্ত মনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও স্বস্তির সাথে তাঁর রবের স্মরণ করে। এর মাধ্যমে তাদের তৃপ্তি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, যেখানে সন্দেহ – সংশয়ের অনুপ্রবেশের কোন অবকাশই থাকেনা, [আশ্–শান্কীতী, আদওয়াউল বায়ান ৫/২৫৯, শাইখ আস্– সা'দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ৪১৭]।

আল্লাহর বাণী, ذِكْرُ اللهِ 'আল্লাহর স্মরণ' এর দ্বারা আল্লাহভীতি এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নিষেধকে স্মরণ করে যা করণীয় তা করা আর যা বর্জনীয় তা ত্যাগ করা উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার এর দ্বারা আল– কুরআনুল কারীমও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ}

'আর নিশ্চয় এটা (কুরআন) আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য যিকর (স্মরণিকাস্বরূপ)', [আয্– যুখরুফ– ৪৩: ৪৪]। এ অর্থে অন্য আরেকটি আয়াতে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}

'অতএব দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণ বিমুখ! তারাস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে', [আয্– যুমার–৩৯ :২২]। তাই 'যিকর' আল– কুরআনের নামসমূহের একটি অন্যতম নাম। সুতরাং আল কুরআনের বিধি– বিধান ও হুকুম– আহকাম জানা, স্থায়ীভাবে দীনে হক চেনা এবং সেগুলোকে দলীল ও প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার কারণে অন্তরের বিশ্বাস ও পরিতৃপ্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা অন্য কোন পুস্তক– গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। আবার এর দ্বারা জিহ্বা ও মুখ দিয়ে আল্লাহর তাসবীহ, তাহমীদ, তহলীল, তাকবীর ইত্যাদী যিকর আযকার গুলোও বুঝায়। কেননা এসব যিকর মুখ থেকে বের হলে তা অন্তর ও হৃদয়কে আল্লাহ তা'আলার মুরাকাবা ও পর্যবেক্ষণের জন্য নাড়া দেয় ও সচেতন করে, [মুহাম্মাদ ইবন 'আশুর, আত্– তাহরীর ওয়াত তানভীর ১৩/১৩৭, শাইখ আস– সা'দী, তাইসীরুল কারীম, পৃ. ৪১৭]। মুখের যিকর– আযকারের অনেক মর্যাদা লাভের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যাতে হৃদয়– মন প্রশান্তি লাভ করে এবং তার বহিঃপ্রকাশ মুখমন্ডল ও আচার– আচরণের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

'যে ব্যক্তি দিনে একশতবার 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর' পড়ে সে ব্যক্তি দশটি দাস স্বাধীন করার সাওয়াব পাবে, তার জন্য একশ'টি নেকী লেখা হবে এবং তার একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শাইতান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হবে এবং তার চেয়ে উত্তম আর কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি এটা তার চেয়ে বেশী পড়ে সে ব্যতিত', [সাহীহুল বুখারী ৪/১২৬, নং ৩২৯৩, সাহীহ মুসলিম ৮/৬৯, নং ৭০১৮]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

‘যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ পাঠ করবে, তার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনতুল্যও হয় তবুও তা মিটিয়ে দেয়া হবে’, [সাহীহুল বুখারী ৮/৮৬, ৬৪০৫, সাহীহ মুসলিম ৮/৬৯, নং ৭০১৮]। আবু মূসা আল– আশ‘আরী (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

‘যে ব্যক্তি তার রবের যিকর করে আর যে করে না তার উদাহরণ হলো জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায়’, [সাহীহুল বুখারী ৮/৮৬, নং ৬৪০৭, সাহীহ মুসলিম ২/৮৮, নং ১৮৫৯]।

বস্তুতঃ করুণাময় মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর ‘ইবাদাত ও আনুগত্য করার মাধ্যমে মানষিক স্বস্তি, হৃদয়ের সুখ, মনের প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তি দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য ও ‘ইবাদাতের যে স্বাদ ও তৃপ্তি মু’মিনগণ পেয়ে থাকে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

‘তিনটি বৈশিষ্ট যার মধ্যে আছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট সবচেয়ে অধিক প্রিয় হওয়া, কোন ব্যক্তিকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা আর কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করা যেমন আগুনে ফেলে দেয়াকে অপছন্দ করা হয়’, [সাহীহুল বুখারী ১/১২, নং ১৬, সাহীহ মুসলিম ১/৪৮, নং ১৭৪]।

আল–‘আব্বাস ইবন ‘আব্দিল মোত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً

‘সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে আর ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে নাবী হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছে’, [সাহীহ মুসলিম ১/৪৬, নং ১৬০]।

‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন যে, আবু সুফইয়ান (রা) তাকে অবহিত করেছেন, হিরাকল তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল যে,

وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ

‘আর আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, কেউ কি তার দীনের মধ্যে প্রবেশ করে এর প্রতি রুষ্ট হয়ে মুরতাদ হয়ে (দীন থেকে ফিরে) যায়? তখন তুমি বলেছো, না। আর ঈমান এমনই হয়, যখন ঈমানের উজ্জ্বলতা অন্তরের সাথে মিশে যায় তখন ঈমানের প্রতি কেউ ক্ষুব্ধ হয় না’, [সাহীহুল বুখারী ১/১৯, নং ৫১, সাহীহ মুসলিম ৫/১৬৩, নং ৪৭০৭]।

'ঈমানের স্বাদ পেয়েছিলেন বলেই তো নাবী– রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারী মু'মিনগণ নানা ধরনের অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন, এমনকি কাউকে কাউকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পরও ঈমান পরিত্যাগ করেননি। আল–ইয়াসিরের সুমাইয়া, ইয়াসির আবু 'আম্মার, 'আম্মার, খাব্বাব ও বিলাল (রা) প্রমূখ তাদের অন্যতম।

শাহাদাতের তৃপ্তি নিয়ে আনাস ইবন মালিকের চাচা আনাস ইবনুন নাযর (রা) ওহুদের যুদ্ধে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জান্নাতের সুঘ্রান পেয়েছিলেন এবং কাফির শত্রুগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত লাভ করেছিলেন। কাফিরগণ তার শারীর ক্ষত– বিক্ষত করেছিল। এসবই আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমানের স্বাদ ও তৃপ্তির ফলেই সম্ভব হয়েছে।

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيَ فِي الصَّلاَةِ

'নিশ্চয় আমার নিকট তোমাদের দুনিয়া থেকে তিনটি বস্তুকে প্রিয় বানানো হয়েছে; স্ত্রীলোক, সুগন্ধি আর সালাতের মধ্যে আমার চক্ষু শীতল করা হয়েছে', [মুসনাদ আহমাদ ৩/১২৮, নং ১২৩১৫, সুনানুন নাসাঈল কুবরা ৭/৬১, নং ৩৯৩৯, আল–বাইহাকী, আস্–সুনানুল কুবরা ৭/৭৮, নং ১৩৮৩৬, আল–হাকিম, আল–মুস্তাদরাক ২/৪৫০, নং ২৬৭৬, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন, সাহীহ ও যা'য়ীফুল জামি' ১/২৯৮, নং ৩১২৪]।

'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرٍ لَنَا مِنَ الأَنْصَارِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيَةُ ائْتُونِي بِوَضُوءٍ لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ قَالَ: فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قُمْ يَا بِلاَلُ أَقِمْ فَأَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ

আমি এবং আমার পিতা ('আলী ইবন আবী তালিব রা) আনসারদের মধ্যে আমাদের এক মেয়ের জামাইর কাছে তার রোগের সেবা–শুশ্রুষা করার জন্য আসলাম। তখন সালাতের সময় হলো। তিনি ('আলী ইবন আবী তালিব রা) তার পরিবারের কাউকে বললেন, হে বালিকা! আমাকে ওযুর পানি দাও। আমি সালাত আদায় করে পরিতৃপ্ত হবো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তার একথার প্রতিবাদ করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'হে বেলাল! উঠ! সালাতের ইকামাত দাও, আমাদেরকে সালাত দ্বারা প্রশান্তি দাও', [সুনানু আবী দাউদ ৪/৪৫৩, নং ৪৯৮৮, মুসনাদ আহমাদ ৫/৩৭১, নং ২৩২০২, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন, সাহীহ ও যা'য়ীফ সুনান আবী দাউদ ১/২ নং ৪৯৮৬]। বস্তুতঃ 'ইবদাতের স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের কতিপয় উপায় আছে, যেমন;

এক. আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, ফলে তার মধ্যে তাঁর আনুগত্যের প্রবাহ সৃষ্টি হবে এবং অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। 'ইবাদাত ও আনুগত্য করার ক্ষেত্রে প্রথমে মন হয়ত চাইবে না। কিন্তু ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতার মাধ্যমে ধারাবাহিক চেষ্টা করতে থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় মনের দৃঢ়তা ও মজবুত সিদ্ধান্ত তৈরী হওয়ার ফলে 'ইবাদাতে তখন

প্রশান্তির লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}

'আর আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন ও তাতে অবিচল থাকুন', [ত্বা-হা- ২০: ১৩২]। অর্থাৎ এ দু'টি কাজের মাধ্যমে এমন ফলাফল এসে যাবে, যাতে আপনার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا}

'তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সে সবের রব। কাজেই তাঁরই 'ইবাদাত করুন এবং তাঁর 'ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকুন। আপনি কি তাঁর সমনামগুণসম্পন্ন কাউকেউ জানেন'? [মারইয়াম- ১৯: ৬৫]।

'ইবাদাতের স্বাদ ও মজা পেতে হলে ছোট- বড়া সকল পাপ ও অপরাধ থেকে দূরে থাকে হবে; কেননা পাপ মনের মধ্যে কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করে এবং 'ইবাদাতের স্বাদ অনুভবের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ইবনুল কাইয়্যেম (রহ) বলেন, বান্দাকে অন্তরের কঠোরতা এবং আল্লাহ থেকে দূরে থাকার চেয়ে বড় আর কোন শাস্তি দেয়া হয়নি', [ইবনুল কাইয়্যেম, ১০২, মুহাম্মাদ সালমান, মাওয়ারিদুয্ যামআন ২/১৫]। তিনি আরো বলেন, পাপ যত বাড়বে নিসঙ্গতা ও ভীতি তত বৃদ্ধি পাবে। তার জীবন যাপনও হবে বিচ্ছিন্ন ও ভীতু মানুষের মতো। আর উত্তম জীবন যাপন হলো বন্ধুত্বসূলভ ও সামাজিক ব্যক্তির মতো। কোন বিবেকবান ব্যক্তি যদি লক্ষ্য করে এবং পাপের তৃপ্তি এবং তা থেকে সৃষ্ট ভীতি ও নিসঙ্গতার মাঝে তুলনা করে তাহলে তিনি তার খারাপ অবস্থা এবং বড় ভুল জানতে পারবেন। কেননা সে 'ইবাদাতের স্বস্তি, এর নিরাপত্তা ও এর স্বাদকে পাপের অস্থিরতা এবং এর অনিবার্য ফলস্বরূপ ভীতি ও তার ক্ষতির বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে, [ইবনুল কাইয়্যেম, আল- জাওয়াবুল কাফি ২/৮৭]। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেন, তুমি যদি তোমার অন্তরে সৎকর্মের স্বাদ না পাও এবং চিত্তের প্রশস্ততা অনুভব না কর তাহলে নিজের অন্তরকেই দায়ী কর। কেননা মহান রব অনেক বড় কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি অবশ্যই দুনিয়াতে বান্দাহকে তার সৎকর্মের প্রতিদান স্বরূপ তৃপ্তি ও স্বাদ দিয়ে প্রতিদান দেন, যা বান্দা তার অন্তরে অনুভব করে, তার হৃদয়ে স্বস্তি আসে এবং চোখ জুড়িয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পায়না তার কর্ম বিফল, [ইবনুল কাইয়্যেম, তাহযীব মাদারিকুস সালিকীন ২/৬৮]।

দুই. বাড়তি খানাপিনা, কথা-বার্তা ও নযর থেকে বিরত থাকা, বান্দা যাতে আল্লাহর 'ইবাদাত ও তার উপযোগী কাজ- কর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য যতটুকুন খাওয়া ও পান করা প্রয়োজন তার মধ্যেই সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়। তার অতিরিক্ত খাওয়া ও পান করা উচিত নয়। আল্লাহ বলেন,

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}

'আর খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় কর না', [আল- আ'রাফ- ৭: ৩১]।

আল– মিকদাম ইবন মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكْلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

'আদম সন্তান পেটের চেয়ে অধিক খারাপ আর কোন পাত্র পূরণ করে না। আদম সন্তানের এতটুকুন খাদ্যই যথেষ্ট, যা তার মেরুদন্ডকে সোজা রাখবে। যদি খুবই প্রয়োজন হয় তাহলে এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, আরেক তৃতীয়াংশ পান করার জন্য এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ নিজের জন্য (খালি) রাখা', [সুনানুত তরিমিযী ৪/৫৯০, নং ২৩৮০, আন্–নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা ৪/১৭৮, নং ৬৭৭০, সাহীহ ইবন হিব্বান, ২/৪৪৯, নং ৬৭৪, ইমাম তিরিমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সাহীহ, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন, সাহীহ ও যা'য়ীফুল জামি' ২/২, নং ৫৬৭৪]।

তিন. 'ইবাদাত হলো আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য, এ কথা বান্দার মনে জাগ্রত করা, বান্দাকে এ কথা মনে করতে হবে যে, এই সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, সাদাকাহ ইত্যাদি 'ইবাদাতগুলো হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করার মাধ্যমে। এসকল 'ইবাদাত আল্লাহ পছন্দ করেন, এগুলোর মাধ্যমে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং 'ইবাদাতই বান্দাকে আল্লাহ সুবহানাহুর নৈকট্য লাভের সহায়ক। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

আল্লাহ বলেন, 'যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেই। আমার বান্দা যা দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে তন্মধ্যে আমি তার উপর যা ফারয করেছি তাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমার বান্দা নাফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে এমনকি আমি তাকে পছন্দ করি। আর আমি যখন তাকে পছন্দ করি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হই, যা দিয়ে সে শোনে, তার দৃষ্টি হই, যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হই, যা দিয়ে সে ধরে, আর তার পা হই, যা দিয়ে সে চলাফেরা করে, (অর্থাৎ আমি তার এ অঙ্গগুলোর হিফাযাত করি, ফলে সে এগুলো দিয়ে কোন পাপ কর্ম করতে পারে না)। যদি সে আমার নিকট চায় আমি তাকে অবশ্যই দেই। আর যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় আমি অবশই আশ্রয় দেই। আর আমি যে কাজ করতে চাই তা করতে সংকোচ করিনা যেমনটি সংকোচ করি কোন মু'মিন ব্যক্তির জান কবয করতে (অর্থাৎ তার প্রতি অনুগ্রহ করে তার রূহকে দ্রুত কবয করতে চাই না), সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার ক্ষতি হওয়াকে অপছন্দ করি', [সাহীহুল বুখারী ৮/১০৫, নং ৬৫০২]।

চার. বান্দাকে মনে রাখতে হবে, 'ইবাদাত কখনো ধ্বংস ও নষ্ট হয় না, আল্লাহর 'ইবাদাত ধ্বংস হয় না, নষ্ট হয় না, যেমন দুনিয়ার সহায়– সম্পত্তি, পদ– পদবী ও ভোগ– বিলাস ধ্বংস হয়, নিঃশেষ হয়। বান্দাকে এই দৃঢ়তা পোষণ করতে হবে। কারণ মানুষ তার একনিষ্ঠ 'ইবাদাতগুলোকে তার সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় উপস্থিত পাবে। এমনকি 'ইবাদাতের সুফল দুনিয়তেও ভোগ করবে এবং পরকালেও তার জন্য এর সুফল আরো বড় ও উৎকৃষ্ট আকারে গচ্ছিত হয়ে থাকবে। যে ব্যক্তি মনের মধ্যে এ বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে সে 'ইবাদাতের মজা ও স্বাদ অনুভব করবে, সে আনন্দিত হবে। সেক্ষেত্রে দুনিয়াতে সে কি হারালো তার ভ্রুক্ষেপও করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا}

'আর যে মু'মিন হয়ে সৎকাজ করে, তার কোন অবিচারের ও অন্য কোন ক্ষতির আশংকা নেই', [ত্বা– হা– ২০: ১১২]। আল–'আব্বাস ইবন 'আব্দিল মোত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً

'সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে আর ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে নাবী হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছে', [সাহীহ মুসলিম ১/৪৬, নং ১৬০]।

মহান আল্লাহ বাণী, **طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ** 'তাদেরই জন্য রয়েছে পরম আনন্দ'। এখানে 'তূবা' শব্দের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ, তাদের জন্য রয়েছে খুশী ও চক্ষুসিক্তকারী। 'ইকরামা বলেন, এর অর্থ, তাদের জন্য যা রয়েছে তা কতইনা উত্তম। যাহ্হাক বলেন, এর অর্থ, তাদের জন্য ঈর্ষান্বিত হওয়ার মত নি'য়ামাত। ইবরাহীম আন্– নাখ'য়ী বলেন এর অর্থ, কল্যাণ। কোন কোন বর্ণনায় আছে 'তূবা' হলো জান্নাতে একটি গাছের নাম, [তাফসীর ইবন কাসীর ৪/৪৫৫]। তবে নিঃসন্দেহে এ সমস্তের মূল অর্থ, জান্নাত। কারণ জান্নাত এসবগুলোর সমষ্টি। জান্নাতের নি'য়ামাত অগণিত, অসংখ্য। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষে জান্নাতে গমনকারীকে বলবেন, তোমার যাবতীয় আকাঙ্খা আমার কাছে ব্যক্ত কর। সে লোক চাইতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত যখন তার চাহিদা শেস হয়ে যাবে। তার আর চাওয়ার কিছু থাকবে না তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, এটা থেকে চাও, ওটা থেকে চাও, এভাবে তাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেবেন। তারপর তিনি তাকে এসব দিয়ে বলবেন, তোমাকে এসবকিছু এবং এগুলোর দশগুণ দেয়া হলো', [সাহীহুল বুখারী, নং ৮০৬, ৮৪৩৭, সাহীহ মুসলিম, নং ১৮২]।

পাঁচ. হালাল রুযী ও খাদ্য খাওয়া, 'ইবাদাতের স্বাদ ও তৃপ্তি পেতে হলে হালাল খাদ্য ও পবিত্র জীবিকা হতে হবে এবং সকল প্রকার হারাম উপার্জন, খানা– পিনা ও জীবন যাপন বর্জন করতে হবে। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

'হে মানব সকল! নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে তাই নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি রাসূলুগণকে দিয়েছেন, তিনি বলেন, {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ..} 'হে রাসূলগণ! আপনার পবিত্র বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎকাজা করুন; নিশ্চয় আপনারা যা করেন সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত', [আল– মু'মিনূন– ২৩: ৫১]। আর তিনি বলেন, {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا..} 'হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমরা যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে খাও', [আল– বাকারাহ– ২: ১৭২], তারপর তিনি একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে তার সফরকে দীর্ঘায়িত করেছে উশ্‌কু– খুশকু, ধুলোমলিন, সে তার দু'হাত আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে ধরেছে, (আর বলছে) হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, আর তার পানীয় হারাম আর তার পরিধেয় পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারা আহার করানো হয়েছে। তার জন্য এ দু'আ কিভাবে কবুল হবে?', [সাহীহ মুসলিম ৩/৮৫, নং ২৩৯৩]।

শিক্ষাসমূহ ঃ

আলোচ্য আয়াত দু'টিতে অনেকগুলো শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ কতিপয় শিক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো;

এক. প্রকৃত মু'মিনগণকে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহই ঈমান পোষণ করতে হবে। ঈমান গ্রহণকে নানা শর্তের জালে আবদ্ধ করার সুযোগ নেই।

দুই. মু'মিনগণকে সর্বদাই নিরংকুশভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, পরিপূর্ণভাবে তাঁর আদেশ– নিদেশ মান্য করতে হবে এবং হাত– পা, অঙ্গ– প্রত্যঙ্গ ও জিহ্বা দ্বারা সেগুলোকে কার্যকরী করতে হবে।

তিন. নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের সর্বদাই তাদের জিহ্বাকে আযকারে মাসনূনাহ দ্বারা সিক্ত রাখা উচিত।

চার. একনিষ্ট মু'মিনগণের আল্লাহর আনুগত্য ও 'ইবাদাতের স্বাদ আস্বাদন ও পরিতৃপ্ত হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

পাঁচ. মহান আল্লাহর রিযামন্দী ও সর্বোচ্চ পুরস্কার জান্নাত লাভের জন্য নির্ভেজাল ঈমান এবং তদনুযায়ী পরিপূর্ণ 'আমল করার আন্তরিক চেষ্টা করে যেতে হবে।

আল্লাহ সকল মু'মিন ও মুসলিমদেরকে এ শিক্ষাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তাবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

"আল-মিকদাম (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি তার নিজ হাতের উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কখনো খায় না। আল্লাহর নাবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করেই খেতেন।"[১]

ব্যাখ্যা : মানুষের জীবন ধারনের জন্য পানাহার অত্যাবশ্যক। এ জন্য তার প্রয়োজন হয় সম্পদের। কিন্তু সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের পূর্ব শর্ত হলো মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করে তা আহরণ করা। মান্না-সালওয়ার মত তা এমনি পাওয়া যাবেনা। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করে তারপর তা ভোগ করতে হবে। এজন্য ব্যবসা, কৃষিকাজ বা অন্য কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعى "আর মানুষ প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছুই অর্জন করতে পারেনা।"[২]

পূণ্য লাভের জন্য যেমন সৎ কাজ ও সাধনা জরুরী, তেমনি সম্পদ লাভের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ জরুরী। আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক ধনভান্ডার হতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সম্পদ আহরণ বা বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের মাধ্যমে আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) বা ট্রাষ্টি (আমানতদার) হিসেবে প্রথমত: সম্পদের মালিক হতে হবে। অত:পর উপার্জিত এ সম্পদ ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বিনিয়োগ করতে পারবে। শ্রমের মাধ্যমেই সাধারণতঃ সম্পদ উপার্জন করা হয় বলে ইসলাম শ্রমের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। এ কারণেই এ হাদীছে নিজ হাতে উপার্জিত সম্পদ থেকে আহারকে মানুষের সর্বোত্তম আহার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অনেকেই কাজ করাকে নিজের জন্য সম্মানজনক মনে করেন না। বিশেষ করে কাজটি যদি হয় সাধারণ বা নিম্নমানের। হাদীছে এ ধারনাকে অপনোদন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কাজের মধ্যেই সম্মান রয়েছে। এ জন্য বিশেষ মর্যাদার অধিকারী একজন নাবী দাউদ (আ.) এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যিনি নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

---

১. বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ', বাবু কাসবিল রাজুলি ওয়া 'আমালিহি বি-ইয়াদিহি, হাদীছ নং ২০৭২।

২. ৫৩, সূরা আন্ নাজ্ম : ৩৯।

নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে যেমন আনন্দ রয়েছে, তেমনি তা সম্মানজনকও। নবীগণের মধ্যে অনেকেই কামার, সুতার, দর্জি, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) নবী হওয়ার পূর্বে অন্যের ছাগল চড়াতেন এবং খাদিজা (রা.) এর ব্যবসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সাহাবা (রা.)ও নিজের কাজ নিজে করতেন এবং কঠোর পরিশ্রম করতেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: «لَوِ اغْتَسَلْتُمْ»،

'আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ ছিলেন শ্রমজীবী। এ কারণে তাদের (দেহ থেকে ঘামের) গন্ধ হতো। তাই তাঁদেরকে বলা হয়েছিল, যদি তোমরা গোসল করতে।[৩]

শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা

শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণেই নবী (সা.) এটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন এবং সে কারণে তিনি শ্রমিকদেরও মর্যাদা এবং সম্মানজনক অধিকার দিয়েছেন। এ হাদীছেও সে মর্যাদার কথাই তিনি বলেছেন।

শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা সংক্রান্ত আরো কয়েকটি হাদীছ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يطَؤُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ،

আবূ বুরদা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন শ্রেণির লোকের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে : আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নাবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপরও ঈমান এনেছে। যে অধীনস্ত দাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মনিবের হকও আদায় করে এবং ঐ ব্যক্তি যার দাসী রয়েছে, যার সাথে সে সহবাস করেছে, এরপর সে তাকে উত্তম শিষ্টাচার ও উত্তম শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছে। অতঃপর তাকে মুক্ত করে দিয়েছে, এরপর তাকে বিয়ে করেছে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।[৪]

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعُهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ

---

৩. বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ', বাবু কাসবিল রাজুলি ওয়া 'আমালিহি বি-ইয়াদিহি, হাদীছ নং ২০৭১।

৪. বুখারী, কিতাবুল 'ইল্‌ম, বাবু তা'লীমির রাজুলি আমাতাহু ওয়া আহলাহু, হাদীছ নং ৯৭।

أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»

হিশাম ইবন ‘উরওয়া থেকে তার পিতা সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ স্বীয় রশি নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে তার পিঠে লাকড়ির বোঝা বহন করে আনা, অত:পর তা বিক্রি করে তা দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করা তার জন্য উত্তম, লোকদের কাছে কিছু চাওয়ার চেয়ে যে চাওয়াতে তাকে কিছু দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে।[৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَكَسَاهَا فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَهُ زَكَاةٌ»

আবু সা‘ঈদ আল খুদরী (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কোনো ব্যক্তি হালাল উৎস থেকে সম্পদ অর্জন করে তা নিজে আহার করে, নিজে পরিধান করে এবং তিনি ব্যতীত আল্লাহর অন্য সৃষ্টিকে খাওয়ায় ও পরিধান করায়, তা তার জন্য সাদাকা হবে।[৬]

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ "

‘আবায়া ইবন রিফয়াহ ইবন রাফি‘ ইবন খাদিজ সূত্রে তার দাদা রাফি‘ ইবন খাদিজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), কোন্ উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির স্বীয় হাতের উপার্জন এবং প্রতিটি বৈধ ব্যবসা।[৭]

শ্রমিকের অধিকার : শ্রমিকের অধিকারের ব্যাপারে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

আল মা‘রূর ইবন সুয়াইদ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাবাযা নামক স্থানে আবু যার (রা.) এর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন তার গায়ে ছিল এক সেট কাপড় এবং তার দাসের গায়েও ছিল এক সেট কাপড়। আমি সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং তার মায়ের নামে তাকে দোষারোপ করেছিলাম। তখন নাবী (সা.) আমাকে বললেন, হে আবু যার, তুমি তাকে তার মায়ের নামে দোষারোপ করলে? তুমি এমন লোক, যার মধ্যে এখনো জাহিলিয়্যাত রয়েছে। তোমাদের অধিনস্ত ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং

---

৫. বায়হাকী, আল আদাব, হাদীছ নং ৭৭৯।
৬. হাকিম, আল্ মুস্তাদ্‌রাক, হাদীছ নং ৭১৭৫।
৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৭২৬৫।

যে ব্যক্তির অধীনে তার ভাই রয়েছে, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে খায় এবং তাকে তাই পরায়, যা সে পরে। তাদেরকে এমন দায়িত্ব দিও না, যা তাদেরকে পরাভুত করে (অর্থাৎ তাদেরকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিওনা)। যদি তাদেরকে তেমন দায়িত্ব দিতেই হয়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করো।[৮]

এ হাদীছে শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আর সেগুলো হলো, তাদের আত্মসম্মান ক্ষুন্ন করা যাবে না, তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এমন কথা বলা বা গালি দেওয়া যাবে না। মানুষ হিসেবে তারা সমমর্যাদার অধিকারী। কেননা তারা তোমাদের ভাই। তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব থাকলে নিজে যা খাবে ও পরবে তাদেরকেও অনুরূপ খাওয়াতে ও পরাতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে ভরন-পোষণ উপযোগী মজুরী দিতে হবে। তাদেরকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া যাবে না এবং কোনো কঠিন কাজ তাদেরকে দিতে হলে সে কাজে তাকে সাহায্য করতে হবে। অন্য হাদীছে রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

"আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাসদাসীদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যা তাদের সাধ্যের বাইরে সে ধরনের কোন কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।"[৯]

কাজ শেষে যথাসময়ে শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও তার শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই।[১০]

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করেনা, কিয়ামতের দিন তাকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي، ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ "

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির

---

৮. বুখারী, কিতাবুল 'ইত্ক, বাবু কাউলিন নাবিয়্যি (সা.) আল্ 'আবীদু ইখওয়ানুকুম ফা আত্'ইম্হুম মিম্মা তা'কুলুন, হাদীছ নং ২৫৪৫।

৯. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইত্'আমুল মামলুকি মিম্মা ইয়া'কুলু হাদীছ নং ১৬৬২।

১০. ইবন মাজাহ, কিতাবুর রুহুন, বাবু আজরিল উজারা', হাদীছ নং ২৪৪৩।

বিরুদ্ধে আমি কিয়ামতের দিন বাদী হবো। আর আমি যার বাদী হবো কিয়ামতের দিন তার উপর মুকাদ্দমা দায়ের করবো। যে ব্যক্তি আমার সাথে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে এবং যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার নিকট থেকে পূর্ণ শ্রম আদায় করে অথচ পরিপূর্ণভাবে তার পারিশ্রমিক দেয় ন।[১১]

শ্রমিকের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো এবং তার সাথে কোন কিছু শরীক করোনা। আর পিতা মাতার প্রতি সদাচরণ করো এবং সদাচরণ করো আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পাশের সঙ্গী, সফরকারী পথিক এবং তোমাদের মালিকাধীন দাসদাসীদের প্রতি। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না"।[১২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুকালে অধিনস্তদের ব্যাপারে ভাল আচরণের ওসিয়্যাত করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: " الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ". حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَرْغِرُ بِهَا صَدْرُهُ، وَمَا يَكَادُ يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ

"আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাধারণ ওসিয়্যাত ছিল, সালাত এবং তোমাদের অধিনস্তগণ! সালাত এবং তোমাদের অধিনস্তগণ! এ কথা তিনি বলতে থাকলেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বুকের মধ্যে গড়গড় শব্দ হতে থাকল এবং যতক্ষণ তার যবান চালু ছিল ততক্ষণ বলতেই থাকলেন।"[১৩]

শ্রমিকের দায়িত্ব :

শ্রমিকদের অধিকার তার দায়িত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথমত: তাকে যথাযথ ও সুন্দরভাবে কাজ করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ "

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করবে, তা যেন সে সুন্দরভাবে করে।[১৪]

দ্বিতীয়ত: তাকে নিয়োগকর্তার অনুগত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

وَالعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ»

---

১১. ইবন মাজাহ, কিতাবুর রুহুন, বাবু আজরিল উজারা', হাদীছ নং ২৪৪২।

১২. ৪, সূরা আন নিসা : ৩৬

১৩. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১২১৬৯।

১৪. বায়হাকী, শো'আবুল ঈমান, হাদীছ নং ৪৯৩১।

আর অধিনস্ত দাস যদি তার রবকে ভয় করে এবং মনিবের আনুগত্য করে, তাহলে তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।[১৫]

তৃতীয়ত: নিয়োগকর্তা বা মনিবের কোনো ক্ষতি যেন না হয়, বরং তার যেন উপকার হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। হাদীছে যেসব ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছাওয়াবের কথা বলা হয়েছে তাদের একজন হলো,

وَالعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ

"ঐ দাস, যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মনিবের কল্যাণ কামনা করে।"[১৬]

চতুর্থত: তাকে আমানতদারী ও দায়িত্বশীলতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"আর সেবক বা শ্রমিক তার কতৃপক্ষের সম্পদে দায়িত্বশীল এবং সে সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৭]

উপসংহার : ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক শ্রমিক ভাই ভাই এবং একে অপরের পরিপূরক ও সহযোগী। পরস্পরের প্রতি তাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য।সুতরাং মালিকের দায়িত্ব হলো শ্রমিকের হক যথাযথভাবে আদায় করা, আর শ্রমিকের দায়িত্ব হলো মালিকের হক ঠিকমত আদায় করা।

শ্রমিককে উপযুক্ত মজুরী দেওয়া, যথাসময়ে মজুরী পরিশোধ করা, তাদের প্রতি সদাচরণ করা, তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া মালিকের দায়িত্ব। অপরদিকে আমানদারীতার সঙ্গে মালিকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করা, তার কল্যাণে কাজ করা, তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা প্রভৃতি শ্রমিকের দায়িত্ব। প্রত্যেককে তার স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যথায় আখিরাতে তাকে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে।"

আল্লাহ আমাদের সকলকে স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন। ■

ড. আবু তাবাসসুম

---

১৫. বুখারী, কিতাবু আহাদিছিল আম্বিয়া, হাদীছ নং ৩৪৪৬ (শেষাংশ)। আবু মুসা আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত।

১৬. বুখারী, কিতাবু জিহাদি ওয়াস সিয়ার, বাবু ফাজলি মান আসলামা মিন আহলিল কিতাবাইন, হাদীছ নং ৩০১১ (শেষাংশ)। আবু বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত।

১৭. বুখারী, কিতাবুল 'ইত্ক, বাব আল্ 'আব্দু রা'ইন ফী মালি সায়্যিদিহি, হাদীছ নং ২৫৫৮ (শেষাংশ)। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত।

হজ্জের বিশ্ব সম্মেলন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

যেসব মুসলমানের ওপর হজ্জ ফরয হয় অর্থাৎ যারা কা'বা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে এমন লোক দু' একজন নয়। প্রত্যেক এলাকায় তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় না। বলতে গেলে প্রত্যেক শহরে কয়েক হাজার এবং প্রত্যেক দেশে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেক বছরই এদের অধিকাংশ লোকই হজ্জ করার ইচ্ছা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। দুনিয়ার যেসব জায়গায় মুসলমান বসবাস করে, তথায় হজ্জের মৌসুম নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী যিন্দেগীর এক নতুন চেতনা কিরূপ জেগে ওঠে, তা সত্যই লক্ষ্য করার মত। প্রায় রমযান থেকে শুরু করে যিলকদ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে শত শত লোক হজ্জ যাত্রায় আয়োজন করে রওয়ানা হয়। আর ওদিকে মহররম মাসের শেষ দিক থেকে সফর, রবিউল আউয়াল তথা রবিউস সানী পর্যন্ত হাজীদের প্রত্যাবর্তনের ধারা চলতে থাকে। এ ছয় মাসকাল পর্যন্ত সকল মুসলিম লোকালয় এক প্রকার ধর্মীয় ভাবধারায় সরগরম হয়ে থাকে। যারা হজ্জে গমন করে আর হজ্জ করে ফিরে আসে, তারা তো ধর্মীয় ভাবধারায় নিমগ্নই হয়ে থাকে ; কিন্তু যারা হজ্জে গমন করে না, হাজীদের রওনা করাতে, এক একটি স্টেশন থেকে তাদের চলে যওয়া আবার ফিরে আসার সময় তাদের অভ্যর্থনা করায় এবং তাদের কাছে হজ্জের বিস্তারিত অবস্থা শুনার ব্যপারে তারাও কিছুটা হজ্জে গমনের আনন্দ লাভ করে থাকে।

এক একজন হাজী যখন হজ্জে গমনের নিয়ত করে, সেই সাথে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী, তাওবা-ইসতেগফার এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের ভাবধারা জেগে ওঠে। সে তারা প্রিয় আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব, সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল লোকের কাছে বিদায় চায়। নিজের সব কাজ-কারবারের চুড়ান্ত রূপ দিতে শুরু করে। এতে মনে হয় যে, সে এখন আর আগের মানুষ নয়, আল্লাহর দিকে তার মনের আকর্ষণ হাওয়ায় দিল পবিত্র হয়ে গেছে। এভাবে এক একজন হাজীর এ পরিবর্তনে তার চারপাশে লোকদের ওপর কত গভীর প্রভাব পড়ে তা অনুমান করা যায়। এরূপ প্রত্যেক বছরই যদি দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গড়ে এক লক্ষ লোকও এই হজ্জ সম্পন্ন করে, তবে তাদের এ গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রভাব আরো কয়েক লক্ষ লোকের চরিত্রের ওপর না পড়ে পারে না। তারপর হাজীদের কাফেলা যে স্থান অতিক্রম করে, তাদেরকে দেখে তাদের সাথে সাক্ষাত করে 'লাব্বাইকা' আওয়ায শুনে সেখানকার কত মানুষের দিল অলৌকিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কত মানুষের লক্ষ্য আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে যায়। আর কত লোকের নিদ্রিত আত্মা হজ্জ করার উৎসাহে জেগে ওঠে। এসব লোক যখন আবার নিজ নিজ দেশের দিকে -দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে হজ্জের প্রাণস্পর্শী ভাবধারা বিস্তার করে প্রত্যাবর্তন করে এবং দলে দলে মানুষ

তাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে, তাদের কাছ থেকে আল্লাহর ঘরের আলোচনা শুনে কত অসংখ্য মানুষের মনে এবং অসংখ্য পরিমন্ডলে ইসলামী ভাবধারা জেগে ওঠে।

এ জন্যই আমি বলতে চাই যে, রযমান মাস যেরূপ বিশ্ব মুসলিমের জন্য তাকওয়া ও পরহেযগারীর মৌসুম তেমনি হজ্জের মাসও বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের মৌসুম। মহান বিজ্ঞ আল্লাহ এ ব্যবস্থা এ জন্য করেছিলেন যেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন শ্লথ না হয়ে যায়। পবিত্র কা'বাকে বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসেবে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যেন মানব দেহের মধ্যে হৃদয়ের অবস্থান। দেহে যতই রোগাক্রান্ত হোক না কেন যত দিন হৃদয়ের স্পন্দন থেমে না যায় এবং সমগ্র দেহ রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি বন্ধ হয়ে না যায় ততদিন যেমন মানুষের মৃত্যু হয় না সেরূপ হজ্জের এ সম্মেলন ব্যবস্থাও যতদিন থাকবে ততদিন ইসলামী আন্দোলনও চলতে থাকবে।

একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেই আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, পৃথিবীর দূর দূরান্তের অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য মানুষ যাদের আকার-আকৃতি, দৈহিক রং ও ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখনই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয় সবাই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নিজ নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে এবং সকলে একই ধরনের অনাড়ম্বর 'ইউনিফরম' পরিধান করে। এহরামের এ 'ইউনিফরম' ধারণ করার পর পরিষ্কার মনে হয় যে, দুনিয়ার হাজার হাজার জাতির মধ্য থেকে এই যে লক্ষ লক্ষ ফোজ আসছে, এরা বিশ্বের বাদশাহ ও যমীন-আসমানের রাজাধিরাজ এক আল্লাহ তাআলারই ফৌজ। এরা দুনিয়ার হাজার হাজার জাতি ও কওম থেকে ভর্তি হয়েছে। এরা সকলে একই বাদশাহর ফৌজ। এদের সকলের ওপর একই সম্রাটের আনুগত্য ও গোলামীর চিহ্ন লেগে আছে, একই বাদশাহর আনুগত্যের সূত্রে এরা সকলেই পরস্পর বিজড়িত রয়েছে এবং একই রাজধানীর দিকে, মহাসম্রাটের সামনে উপস্থিত হবার জন্য ছুটে চলেছে। একই 'ইউনিফরম' পরিহিত এ সিপাহী 'মীকাত' অতিক্রম করে যখন সামনে অগ্রসর হয়, তখন সকলের কণ্ঠ থেকে এ একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ -বাতাস মুখরিত করে তোলেঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ،

উচ্চারণের কণ্ঠ বিভিন্ন কিন্তু সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি। কেন্দ্র যত নিকটবর্তী হয়, ব্যবধান ততই কমে যায়। বিভিন্ন দেশের কাফেলা পরস্পর মিলিত হয় এবং সকলেই একত্রিত হয়ে একই পদ্ধতিতে নামায পড়ে, সকলের পোশাক এক, সকলেরই ইমাম এক, একই গতিবিধিতে ও একই ভাষায় সকলের নামায পড়া, সকলেই এক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করে, রুকূ-সিজদা করে, সকলে একই আরবী ভাষায় কুরআন পড়ে এবং শুনে। এভাবে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষা, জাতি, দেশ, বংশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য চূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যায়। সমগ্র মানুষের সমন্বয়ে 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী' একটি বিরাট জামায়াত রচিত হয়। তার পর এ বিরাট আন্তর্জাতিক জামায়াত একই আওয়ায 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' ধ্বনি করতে করতে চলতে থাকে। পথের প্রত্যেক চড়াই উৎরাইয়ে যখন এ আওয়ায উত্থিত হয়, যখন নামাযের সময়ে এবং প্রভাতে এ শব্দ অনুরণিত হয়ে ওঠে, যখন কাফেলাসমূহ পরস্পর মিলিত হবার সময় এ শব্দই ধ্বনিত হয়ে ওঠে তখন

চারদিকে এক আশ্চর্য রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সে পরিবেশে মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, এক অচিন্তনীয় ভাবধারায় সে মত্ত হয়ে পড়ে, 'লাব্বাইকা' ধ্বনির আকর্ষণে সে এক ভাবজগতে ছুটে যায়। অতপর কা'বায় পৌছে দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সমাগত জনসমুদ্রের একই পোশাকে নির্দিষ্ট কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা, সকলের একই সাথে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো, সকলের মিনায় উপস্থিত হয়ে তাবু জীবনযাপন করা এবং তথায় এক ইমামের কণ্ঠে ভাষণ (খোতবা) শ্রবণ করা, তারপর মুযদালিফায় তাবুর নীচে রাত্রি যাপন করা, আবার মিনার দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন করা, সকলে মিলে আকাবায় পাথর দ্বারা চাঁদমারী করা, তারপর সকলের কুরবানী করা, সকলের একই কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে নামায পড়া। এসব কাজে যে পবিত্র পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মে বা জীবন ব্যবস্থায় তার তুলনা নেই।

তারপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে আগত অসংখ্য মানুষের একই কেন্দ্রে সম্মিলিত হওয়া এমন নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং ঐক্যভাবের সাথে একত্রিত হওয়া এমন পবিত্র উদ্দেশ্য ও ভাবধারা এবং নির্মল কাজ-কর্ম সহকারে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা প্রকৃতপক্ষে আদম সন্তানের জন্য এটা এক বড় নিয়ামত। এ নিয়ামত ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মই দিতে পারেনি। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির পরস্পর মিলিত হওয়া কোন নুতন কথা নয় চিরকালই এরূপ হয়েছে। কিন্তু তাদের এ সম্মেলন হয় যুদ্ধের ময়দানে একে অপরের গলা কাটার জন্যে অথবা সন্ধি সম্মেলনে বিজিত দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেবার জন্যে কিংবা বিশ্বজাতি সম্মেলনে এক একটি জাতির বিরুদ্ধে ধোঁকা ও প্রতারণার ষড়যন্ত্র, যুলুম এবং বেঈমানীর জাল ছড়াবার জন্য; অথবা পরের ক্ষতি সাধন করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার মতলবে। সমগ্র জাতির জনসাধারণের নির্মল মন, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্র মনোভাব নিয়ে এবং প্রেম ভালোবাসা, নিষ্ঠা, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যভাব সহকারে একত্রিত হওয়া। চিন্তা, কর্ম এবং উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে মিলিত হওয়া, তাও আবার একবার মিলিত হয়েই ক্ষান্ত না হওয়া বরং চিরকালের জন্য প্রত্যেক বছর একই কেন্দ্রে একত্রিত হওয়া বিশ্বমানবতার প্রতি এতবড় নিয়ামত দুনিয়ায় ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম ব্যবস্থাই দিতে পেরেছে কি? বিশ্ব শান্তি স্থাপনে জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ মিটিয়ে দেয়া এবং লড়াই ঝগড়ার পরিবর্তে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কেউ পেশ করতে পেরেছে কি? ইসলাম শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি ; সে আরো অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

বছরের চারটি মাস হজ্জ ও ওমরার কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলাম কা'বা যাতায়াতের এ চারটি মাস সমস্ত পথেই শান্তি অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এটা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি রক্ষা করার এক স্থায়ী ব্যবস্থা। দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে আসলে হজ্জ ও ওমরার কারণে একটি বছরের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সময় চিরকালের জন্য যুদ্ধ এবং রক্তারক্তির হাত থেকে দুনিয়া রক্ষা পেতে পারে।

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে একটি হেরেম দান করেছে। এ হেরেম কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির কেন্দ্রস্থল। এখানে মানুষ মারা তো দূরের কথা, কোনো জন্তুও শিকার করা যেতে পারে না।

এমনকি এখানকার ঘাসও কেটে ফেলার অনুমতি নেই। এখানকার কোনো কাঁটাও চূর্ণ করা যায় না, কারো কোন জিনিস এখানে পড়ে থাকলে তা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। ইসলাম পৃথিবীর বুকে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ শহরে কারো কোন হাতিয়ার নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এখানে খাদ্যশস্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সঞ্চয় করে রাখা এবং তার ফলে মূল্য বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করা পরিষ্কার আল্লাহদ্রোহীতা। এখানে যারা অন্যের ওপর যুলুম করে তাদেরকে অল্লাহ পাক এই বলে সাবধান করে দিয়েছেনঃ "নুযিকহুমিন আযাবুন আলিম" অর্থ "আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব।"

ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর একটি কেন্দ্র নির্ধারিত করেছে। এ কেন্দ্রের পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছেঃ

سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ "যারা আল্লাহর প্রভুত্ব ও বাদশাহী এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত ও নেতৃত্ব স্বীকার করে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘে প্রবেশ করবে, ইসলামের এ কেন্দ্রে তাদের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে।" আমেরিকার বাসিন্দা হোক কি আফ্রিকার, চীনের বাসিন্দা হোক কি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের, সে যদি মুসলামান হয় তবেই মক্কা শরীফে তার অধিকার মক্কার আসল বাসিন্দাদের অনুরূপ হবে। সমগ্র হারাম শরীফের এলাকা মসজিদের ন্যায়। মসজিদে গিয়ে যে মুসলমান নিজের জন্য কোনো স্থান করে নেয়, সে স্থান তারই হয়ে যায়; কেউ তাকে সেই স্থান থেকে বিতাড়িত করতে পারে না, কেউ তার কাছে ভাড়া চাইতে পারে না। কিন্তু সে যদি সারা জীবনও সেই স্থানে বসে থাকে, তবুও সেই স্থানকে নিজের মালিকানা স্বত্ব বলে দাবী করতে এবং তা বিক্রি করতে পারে না। এর জন্য সে ভাড়াও চাইতে পারে না। এভাবে সেই ব্যক্তি যখন সেই স্থান থেকে চলে যাবে তখন অন্য কেউ এসে এখানে আসন করে নিতে পারে, যেমন পূর্বের লোকটি পেরেছিল। 'হারাম শারীফের' অবস্থাও ঠিক এরূপ।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ " মক্কা নগরের যে স্থানে এসে যে ব্যক্তি প্রথমে অবতরণ করবে সেই স্থান তারই হবে।" এখানকার বাড়ী-ঘরের ভাড়া আদায় করা জায়েজ নয়। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানকার লোকদের ঘরের সম্মুখস্ত প্রাঙ্গণের দুয়ার বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে লোকেরা তাদের প্রাঙ্গনে এসে অবস্থান করতে পারে। কোন কোন ফকীহ এতদূরও বলেছেন যে, মক্কা নগরীর বাড়ীঘরের কেউ মালিক নয়, তা উত্তরাধিকার নীতি অনুসারে বন্টনও হতে পারে না। এসব সুযোগ-সুবিধা এবং আযাদীর মূল্যবান নিয়ামত দুনিয়ার মানুষ ইসলাম ভিন্ন অন্য কোথাও পেতে পারে কি?

এহেন হজ্জ সম্পর্কেই বলা হয়েছিলঃ তোমরা এটা করে দেখ এতে তোমাদের জন্য কতবড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার সমস্ত কল্যাণকে গুণে গুণে বলার শক্তি আমার নেই। কিন্তু তবুও এই পর্যন্ত তার যে কিঞ্চিত বিবরণ ওপরে পেশ করেছি তা থেকে এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণ লাভ করা যাবে।

কিন্তু এসব কথা শুনার পর আমার নিজের মনের দুঃখের কথাও খানিকটা শুনুন। বংশানুক্রমিক মুসলমান হীরক খনি অভ্যন্তরে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত। এ শিশু যখন জন্ম মুহূর্ত

থেকেই চারদিকে কেবল হীরক দেখতে পায় এবং হীরক খন্ড নিয়ে খেলা করতে থাকে, তখন তার দৃষ্টিতে হীরকের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদও সাধারণ পাথরের মতই মূল্যহীন হয়ে যায়। বংশীয় মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক এরূপ। সমগ্র জগত যে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং যা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তারা নানা প্রকার দুঃখ-মুসিবতে নিমজ্জিত রয়েছে, আর বিশ্ব মানব যার সন্ধান করতে ব্যাকুল রয়েছে, সেই মূল্যবান নিয়ামতসমূহ বর্তমান মুসলমানরা বিনামূল্যে লাভ করেছে, এজন্য তালাশ-অনুসন্ধান এবং খোঁজাখুজির জন্য একবিন্দু পরিশ্রমও তাদের করতে হয়নি। এসব ছাড়াই তারা এটা পেয়েছে শুধু এ জন্য যে, সৌভাগ্যবশত তারা মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেছে। যে কালেমায়ে তাওহীদ মানব জীবনের সমগ্র জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দিতে পারে শিশুকাল থেকেই তা তাদের কানে প্রবেশ করেছে, মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানাতে এবং লোকদের পরস্পরের ভাই ও দরদী বন্ধুতে পরিণত করার জন্য নামায-রোযা স্পর্শমণি অপেক্ষাও বেশী মূল্যবান। এরা জন্মলাভ করেই বাপ-দাদার উত্তরাধিকার হিসেবে এটা লাভ করেছে। যাকাত ইসলামী সমাজের এক অতুলনীয় ব্যবস্থা, এ দ্বারা শুধু মনের নাপাকীই দূর হয় না, দুনিয়ার অর্থব্যবস্থাও সুষ্ঠুতা লাভ করে, যা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়ার মানুষ একে অপরের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। এটা মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু মুসলমানরা তা বিনা ব্যয়ে এবং বিনা শ্রমে লাভ করেছে। এটা ঠিক তেমনিভাবে, যেমন খবু বড় চিকিৎসকের সন্তান ঘরে বসেই বড় বড় রোগের তালিকা বিনামূল্যে লাভ করে থাকে। অথচ এর জন্য অন্যান্য মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে সন্ধান করে বেড়ায়। হজ্জও একটি বিরাট ব্যবস্থা, সমগ্র দুনিয়ায় এর কোনো তুলনা নেই। পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামী আন্দোলনের আওয়াজ পৌঁছাবার জন্য এবং আন্দোলনকে চিরকালের তরে জীবিত রাখার জন্য এটা অপেক্ষা শক্তিশালী উপায় আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোন থেকে এক আল্লাহর নামে টেনে এনে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে দেয়া এবং অসংখ্য বংশ গোত্র ও জাতিকে এক আল্লায় বিশ্বাসী, সদুদ্দেশ্য সম্পন্ন ও সৌহার্দপূর্ণ ভ্রাতৃসংঘে সম্মিলিত করে দেবার জন্য এটা আপেক্ষা উন্নততর কোনো পন্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। যুগ-যুগান্তর থেকে জীবন্ত ও প্রচলিত এ ব্যবস্থাও মুসলমানগণ নিজেদের সম্পদ হিসেবে লাভ করেছে বিনা চেষ্টায় এবং বিনা শ্রমে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা এই যে, মুসলমান বিনাশ্রমে প্রাপ্ত এ মূল্যবান সম্পদের কোন কদর বোঝেনি, বরং তারা এটা নিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে খেলা করছে, যেমন হীরক খণ্ড নিয়ে খেলা করে হীরক খনিতে প্রসূত শিশু সন্তান। আর তাকে সে মনে করে সাধারণ পাথরের ন্যায় মূল্যহীন। মুসলমান নিজেদের মূর্খতা এবং অজ্ঞতার কারণে এ বিরাট মূল্যবান সম্পদ ও শক্তির উৎস নিয়ে অত্যন্ত হীনভাবে খেলা করছে। এর অপচয় করছে, এটাকে নষ্ট করছে, এসব দেখে আমার প্রাণ জ্বলে যায়। পাথর চূর্ণকারীর হাতে মূল্যবান হীরক খণ্ড বরবাদ হতে দেখে সহ্য করা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। নামায-রোযা হোক, কিংবা হজ্জ হোক, এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রশিক্ষণ। কিন্তু যারা এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে চায় না এর উপকার ও কল্যাণ লাভ করার কথা এতটুকুও ভাবে না; বরং যারা এ ইবাদাত সমূহের যে কোনো মাকছুদ ও উদ্দেশ্য থাকতে

পারে তৎসম্পর্কেও বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা রাখে না। তারা যদি পূর্ববর্তী লোকদের দেখাদেখি শুধু ওগুলোর নকলই করতে থাকে, তাহলে এটা দ্বারা সেই সুফল আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণত আজকের মুসলমানগণ এভাবেই ঐ ইবাদাত গুলো করে চলেছে। সকল ইবাদাতের বাহ্যিকরূপ তারা ঠিকই বজায় রাখছে ; কিন্তু (লক্ষ ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকার কারণে) এতে কোন প্রাণ শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক ইসলামের কেন্দ্রে গমন করে এবং হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করে ফিরে আসে ঠিক কিন্তু হারাম শরীফের যাত্রীর স্বভাব-চরিত্রে যে পরিবর্তন কাম্য ছিল, তা যেমন দেখা যায় না তেমনি হজ্জ থেকে ফিরে আসার পরও তার মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। অনুরূপভাবে যে সকল এলাকা অতিক্রম করে হজ্জে গমন করা হয়, সেখানকার মুসলমান-অমুসলমান অধিবাসীদের ওপরেও তার কোন উত্তম চরিত্রের প্রভাব পতিত হয় না। বরং অনেকের অসৎ স্বভাব, বদমেজাজী, অশালীন ব্যবহার ও চারিত্রিক দুর্বলতা ইসলামের সম্মানকে বিনষ্ট করে দেয়। বস্তুত এসব কারণেই আমাদের অনেক মুসলিম যুবকও প্রশ্ন করেন যে, 'হজ্জের উপকার আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন।' অথচ হজ্জ তো ছিল এমন এক জিনিস যে তাকে প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করা হলে কাফেররাও এর উপকার প্রকাশ্যে দেখে ইসলাম গ্রহণ করতো। যদি কোনো আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ সদস্য প্রতি বছর বিশ্বের সকল অঞ্চল থেকে এক স্থানে সমবেত হয় এবং আবার নিজ নিজ দেশে ফিরে যায় বিভিন্ন দেশে ও নগর হয়ে যাওয়ার সময়ে নিজেরদের পবিত্র জীবন, পবিত্র চিন্তাধারা ও পবিত্র নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয়, যেখানে যেখানে অবস্থান করে কিংবা যে যে স্থান অতিক্রম করে সেখানে নিজেদের আন্দোলনের যাবতীয় মৌলিক আলোচনা নীতির শুধু মৌখিক না করে আপন আচরণ ও কর্মতৎপরতায়ও তাকে বাস্তবায়িত করতে থাকে, আর এটা শুধু দশ-বিশ বছরেই নয় বরং বছরের পর বছর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরেই চলতে থাকে তাহলে বলুন তো, এটা কোনো নিষ্ক্রিয় জিনিস থেকে হতে পারে কি? প্রকৃতপক্ষে হজ্জ এরূপ হলে তার উপকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজনই হতো না। তখন অন্ধ ব্যক্তিও এর উপকার দেখতে পেত। বধির ব্যক্তিও এর কল্যাণ শুনতে পারতো। প্রতি বছরের হজ্জ কোটি কোটি মুসলমানকে নেক বান্দায় পরিণত করতো, হাজার হাজার অমুসলমানকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করতো, লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের অন্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল করে দিত। কিন্তু আফসোস! আমাদের মূর্খতার কারণে কত বড় মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে।

হজ্জের অন্তর্নিহিত এ বিরাট সার্থকতা ও উপকারিতা পুরোপুরি লাভ করার জন্য ইসলামের কেন্দ্রস্থলে কোনো বিরাট শক্তিসম্পন্ন কর্তৃত্ব বর্তমান থাকা উচিত। যা এ মহান বিশ্ব শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। এখানে এমন একটি হৃৎপিন্ড (দিল) থাকা উচিত ছিল যা প্রত্যেক বছর সমগ্র বিশ্ব দেহে তাজা রক্তের দ্বারা প্রবাহিত করতে সক্ষম। এমন একটি মস্তিষ্ক থাকারও দরকার ছিল যা এ হাজার হাজার আল্লাহর দূতের মারফতে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম পৌঁছাতে চেষ্টা করতো। আর কিছু না হোক, অন্তত এ কেন্দ্র ভূমিতে খালেস ইসলামী জীবন ধারার বাস্তব রূপ যদি বর্তমান থাকতো, তবুও দুনিয়ার

মুসলামান প্রত্যেক বছরই সেখান থেকে খালেস ইসলামী জিন্দেগী এবং দ্বীনদারীর শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এখানে তেমন কিছুই নেই। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরব দেশে মূর্খতার অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু করে ওসমানী যুগ পর্যন্ত সকল অক্ষম ও অনুপযুক্ত শাসক ইসলামের কেন্দ্রেস্থলের অধীবাসীগণকে উন্নতি লাভের সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে কয়েক শতাব্দীকাল ধরে তাদেরকে কেবল অধঃপতনের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। ফলে আরব দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সকল দিক দিয়েই অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। এ কারণে যে ভূখণ্ড থেকে একদা ইসলামের বিশ্বপ্লাবী আলোক ধারা উৎসারিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আজ তাই ইসলামের পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের ন্যায় অন্ধ কুপে পরিণত হয়েছে। এখন সেখানে ইসলামের জ্ঞান নেই, ইসলামী জীবনধারা নেই। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে বুকভরা আশা ও ভক্তি নিয়ে প্রত্যেক বছর পাক 'হারামে' আগমন করে; কিন্তু এ এলাকায় পৌছে তার চারদিকে যখন কেবল মূর্খতা, মলিনতা, লোভ-লালসা, নির্লজ্জতা, আত্মপূজা, চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃংখলতা এবং জনগণের নির্মম অধঃপতিত অবস্থা দেখতে পায়, তখন তাদের আশা-আকাঙ্খার স্বপ্ন জাল ছিন্ন হয়ে যায়। এখন অনেক লোক হজ্জ করে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তাকে অধিকতর দুর্বলই করে আসে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পরে জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশে যে পৌরোহিত্যবাদ ও ঠাকুর পূজার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল এবং যা শেষ নবী হযরত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্মূল করেছিলেন, আজ তা-ই প্রবলরূপে পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। 'হারামে কা'বার' ব্যবস্থাপক পূর্বের ন্যায় আবার সেবায়েত হয়ে বসেছে। আল্লাহর ঘর তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ঘরের প্রতি যারা ভক্তি রাখে তারা এদের শিকার বিশেষ। বিভিন্ন দেশে বড় বড় বেতনভুক্ত এজেন্ট নিযুক্ত রয়েছে, তারা ভক্তদেরকে চারদিক থেকে টেনে টেনে নিয়ে আসে। কুরআনের আয়াত আর হাদীসের নির্দেশ পড়ে শুনিয়ে তাদেরেকে হজ্জ যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে এজন্য নয় যে, আল্লাহ তাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। বরং তাতে তাদের যথেষ্ট আমদানী হবে। এসব দেখে পরিষ্কার মনে হয় যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল এ বিরাট ব্যাবস্থা করেছেন শুধু এ পুরোহিত 'পাণ্ডা' এবং দালালদের প্রতিপালনের জন্য। তারপর হজ্জ যাত্রায় বাধ্য হয়ে মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন সফরের শুরু থেকে হজ্জ করে বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় ধর্মীয় মজুর এবং ধর্ম ব্যবসায়ীরা জোকের ন্যায় তাদের সামনে উপস্থিত হয়। মুয়াল্লেম, তাওয়াফ শিক্ষাদাতা, কা'বা কুঞ্জিকা বাহক এবং স্বয়ং হেজায সরকার, সকলেই এ ধর্ম ব্যবসায়ে সমানভাবে অংশিদার। হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানাদিই পয়সা দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। এমন কি পবিত্র কা'বা গৃহের দরজাও পয়সা ব্যতীরেকে কোনো মুসলমানদের জন্য উম্মুক্ত হতে পারে না। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। ইসলামের এ তথাকথিত খাদেমগণ এবং কেন্দ্রীয়

উপাসনাগারের সেবায়েতগণও শেষ পর্যন্ত বেনারস ও হরিদ্বারের পণ্ডিত পুরোহিতদের পেশা অবলম্বন করে নিয়েছে, অথচ এটাই একদা এ পুরোহিতবাদদের মূলোচ্ছেদ করেছিল। যেখানে ইবাদাত করানোর কাজ বিশেষ ব্যবসায় এবং ইবাদাতের স্থান উপার্জনের উপায়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে আল্লাহর আয়াত কেবল এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যে, লোকে তা শুনে হজ্জ করতে বাধ্য হবে এবং এ সুযোগে তার পকেট মেরে টাকা নিয়ে যাবে। যেখানে ইবাদতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মূল্য দিতে হয় এবং দ্বীনি কর্তব্য ব্যবসায়ের পণ্য হয়- এমতস্থানের ইবাদতে ইসলামের প্রাণ শক্তি কি করে বেঁচে থাকতে পারে। হাজীগণ যে এ ইবাদাতের প্রকৃত নৈতিক আধ্যাত্মিক উপকারিতা লাভ করতে পারবে সমস্ত কাজ যখন একটি কেনা-বেচার মাল হয়ে রয়েছেড় তখন এমন আশা কিছুতেই করা যায় না।

এ আলোচনা দ্বারা কারো ওপর দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু বলতে চাই হজ্জের ন্যায় একটি বিরাট শক্তিকে কোন্ কোন্ জিনিস প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন করে দিয়েছে।

ইসলাম এবং ইসলাম প্রবর্তিত নিয়মসমূহে কোনো ত্রুটি রয়েছে, এরূপ ধারণা কারোই মনে যেন না জাগে। কারণ তাতে আসলে কোনোই ত্রুটি নেই ত্রুটি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে পূর্ণ ইসলামের অনুসরণ করে চলে না। অতএব, এ অবস্থার জন্য দায়ী বর্তমান মুসলমানরাই। তাই যে ব্যবস্থা তাদেরকে মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শে পরিচালিত করতে পারতো এবং যা অনুসরণ করে তারা নেতা হতে পারতো, তা থেকে আজ কোনো ভাল ফল লাভ করা যাচ্ছে না। এমনকি অবস্থা এতদূর খারাপ হয়ে গেছে যে, এ ব্যবস্থাই মানবতার পক্ষে সত্যই কল্যাণকর কিনা আজ সে সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে শুরু করেছে।একজন সুদক্ষ চিকিৎসক যদি কয়েকটি অব্যর্থ ওষুধের তালিকা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তার অকর্মণ্য ও নির্বোধ উত্তরাধিকারীগণের হাতে তা একেবারেই 'অকেজো' হয়ে যায়। ফলে সেই তালিকারও যেমন কোনো মূল্য হয় না, অনুরূপভাবে স্বয়ং চিকিৎসকের দুর্নাম হয়, আসল তালিকা যতই ভাল, সঠিক এবং অব্যর্থ হোক না কেন। এতএব এ নির্ভূল তালিকাকে কার্যকর করে তুলতে হলে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অপরিহার্য। অপটু ও অজ্ঞ লোকরা সেই তালিকা অনুযায়ী ওষুধ তৈরী করলে তা দ্বারা যেমন কোনো উপকার পাওয়া যাবে না শুধু তাই নয়, বরং তাতে ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। ফলে জাহেল লোকেরা যারা তালিকার যথার্থতা যাচাই করতে নিজেরা অক্ষম, তারাই শেষ পর্যন্ত মনে করতে শুরু করবে যে, মূলত তালিকাটাই ভুল। বর্তমান মুসলমানদের সর্বাত্মক অধঃপতনের ব্যাপারে ইসলামেরও ঠিক এ অবস্থা হয়েছে। ■

‘রামমোহন আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা’ সংকটে আমাদের সংস্কৃতি, রাজনীতিও

আবুল আসাদ

ক্ষতির দিক দিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক পতন অত্যন্ত ভয়াবহ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতন চেষ্টা করলে, সুযোগ পেলে আজ না হয় কাল সামলে নেওয়া যায়। কিন্তু সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক পতন সামলে নিতে নাকি লাগে শতাব্দী। আশঙ্কার কথা, আমাদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর এবং কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্বের বুদ্ধিভিত্তিক অধঃপতন আমাদের জাতীয় পরিচয়ের (indetity) উদ্বেগজনক পতনমুখীতার ইঙ্গিত দেয়। খুব ছোট একটা উদাহরণ সামনে এনে আজকের এই লিখাটা শুরু করছি।

আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রী ১লা বৈশাখের শোভাযাত্রা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এক অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতায় বলেছেন, ‘তিনি ‘আনন্দ শোভাযাত্রা’ ও ‘মঙ্গল শোভাযাত্রার’ মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না।’ এ কথা ঠিক যে, দৃশ্যত: কোন পার্থক্য অবশ্যই চোখে পড়ে না। ‘আনন্দ’ ও ‘মঙ্গল’ দু’টোই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ। কিন্তু ভাষার শব্দগুলোর মধ্যে কিছু শব্দ এমন রয়েছে, যার কালচারাল বা ধর্মীয় আচারগত একটা রুট বা পরিচয় আছে। মঙ্গল শব্দের এমন একটা আচারগত পরিচয় পাওয়া যায়, যা ‘আনন্দ’ শব্দের ক্ষেত্রে নেই। অভিধানে ‘মঙ্গল’ শব্দের চার ধরনের অর্থ করা হয়েছে। চতুর্থ অর্থটা হলো হিন্দুদের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাজ বা পালাগান, যেমন চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল।[১] অনুরূপভাবে ‘মঙ্গলগীত’ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে : ‘হিন্দুদের দেব-দেবীর মাহাত্ম্য গান।’[২] একইভাবে অভিধানে ‘মঙ্গলময়ী’ শব্দের অর্থ (হিন্দু ধর্মে) ‘দুর্গাদেবী’।[৩] দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় পরিচয়-নিরপেক্ষ শব্দের আগে বা পরে বিশেষণ হিসাবে বা বিশেষ্য হিসাবে ‘মঙ্গল’ শব্দ বসলেই তা হিন্দু আচার, হিন্দু বিশ্বাস বা হিন্দু দেব-দেবীর পরিচয় জ্ঞাপক হয়ে যাচ্ছে। উপরের দৃষ্টান্তে পরিচয়-নিরপেক্ষ ‘গীত’ শব্দের আগে ‘মঙ্গল’ বসায় ‘মঙ্গলগীত’ হিন্দু দেব-দেবীদের প্রশংসা কীর্তন হয়েছে। আবার ‘ময়ী’ শব্দের সাথে ‘মঙ্গল’ শব্দ বসায় ‘মঙ্গলময়ী’ শব্দটি হিন্দু দেবী দুর্গা হয়ে গেছে। অনুরূপভাবেই শোভাযাত্রার সাথে যখন ‘মঙ্গল’ শব্দ

১. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-৯৪৫ (শব্দ : মঙ্গল)
২. ঐ
৩. ঐ

বসানো হয় তখন 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' হিন্দু আচার-সাংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এই কারণেই দেখা গেছে, বৈশাখের আনন্দ শোভাযাত্রায় মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই আনন্দ শোভাযাত্রাকে যখন 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বানানো হলো, দেখা গেল তাতে মূর্তি এবং মূর্তিধর্মী প্রতীকের ছড়াছড়ি।

শোভাযাত্রার 'মঙ্গল' নাম নিয়ে এখানেই উঠেছে আপত্তি। আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রী একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার পরেও 'আনন্দ শোভাযাত্রা' এবং 'মঙ্গল শোভাযাত্রার' পার্থক্য জানেন না বা বোঝেন না এটা বিস্ময়কর। হতে পারে এটা বিষয়টার দিকে উপযুক্ত মনোযোগ না দেয়া জনিত অজ্ঞতা। একজন সচেতন ব্যক্তির জন্য বিশেষ করে একজন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রীর জন্য এটা শুধুই অজ্ঞতা নয় অপরাধ। আমাদের সচেতন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের এই ধরনের অপরাধ আমাদের জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক সংকট, সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং অবশেষে বুদ্ধিভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক পতন ডেকে আনার জন্য দায়ী।

একজন হায়াৎ মামুদের কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে। বেশ আগের কথা। তখন তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর 'বাঙালিত্ব সাধনার যাত্রাবিন্দু' শীর্ষক নিবন্ধে বুদ্ধিভিত্তিক পতনের একটা মারাত্মক ধ্বস আমি অবলোকন করেছি। এরকম ধ্বস অনেকের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক লিখায় দেখি। কিন্তু তারটাই আমি বিশেষভাবে সামনে আনলাম এ কারণে যে, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের সিঁড়িতে তার স্থানটা বেশ উঁচু। তার প্রকৃত নাম মনিরুজ্জামান। হায়াৎ মামুদ তার 'পেননেম'। পশ্চিম বঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি। একুশে পদক পান তিনি ১৯১৬ সনে। বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পুরস্কারও তিনি পান। সুতরাং যে সে ব্যক্তিত্ব তিনি নন। তিনি শুন্যগর্ভ ব্যক্তিত্ব হবেন, কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক হবেন, কিংবা বিভ্রান্ত লোক হবেন এমনটা কোন সময়েই ভাবিনি। ভাবলাম, তাঁর 'বাঙালিত্ব সাধনার যাত্রা বিন্দু' প্রবন্ধটি পড়ে। ভাবলাম, বাঙালীত্ব সাধনার যাত্রা বিন্দু খুঁজতে গিয়ে তিনি পথ হারিয়েছেন। পথভ্রষ্ট হয়ে বা বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ভুল যাত্রা বিন্দু খুঁজে পেয়েছেন। বাঙালীত্ব সাধনার যাত্রা বিন্দু হিসেবে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন রাজা রামমোহন রায়কে। রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন জনাব হায়াৎ মামুদ। তিনি লিখেছেন, "বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতির যে সামগ্রিক অবয়ব ও অন্তর্লীন চরিত্র গুণ আজ আমরা সনাক্ত করে থাকি তার আদি পিতা তিনি। তাকে চিনতে পারলে তাই বাঙালী হিসেবে আমার অবস্থান ও গন্তব্য উভয়েরই পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়।"[৪]

৪. 'বাঙালীত্ব সাধনার যাত্রাবিন্দু', হায়াৎ মামুদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১লা বৈশাখ সংখ্যা, ১৯৯২

রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা বলার কারণ হিসেবে জনাব হায়াৎ মামুদ রাজা রামমোহনের কিছু গুণ বর্ণনা করেন। তার বর্ণিত গুণগুলোর কেন্দ্রবিন্দু হলো, রাজা রামমোহন রায় সব ধর্মীয় বন্ধনের ঊর্ধে উঠে তিনি সকল মানুষের হয়ে গিয়েছিলেন। হায়াৎ মামুদ সাহেব লিখেছেন, "যেকোনো নির্দিষ্ট ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের সম্বন্ধ সাধারণত: নির্নীত হয়ে থাকে এ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির ও কথিত বাণীর নিরিখে, সেক্ষেত্রে ধর্মানুসারীদের একমাত্র বিবেচ্য ও কর্তব্য হয় ধর্মীয় নির্দেশকে বিচারের উর্ধে রেখে তা নির্দ্বিধ চিত্তে মান্য করে যাওয়া। রামমোহন বিচারের উর্ধ্বে রাখেন নি, মান্যও সর্বদা করেননি।.....

....He is neither Christian, a Mohammedan, or a Hindu, but freethinking man.

কোন বিশেষ ধর্ম নয় সর্বস্বত্ত্ব-সার তিনি ছেঁকে তুলে নিয়ে- তাদের সংশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিবোধ প্রয়োগ করে।"[৫]

অর্থাৎ রামমোহন রায় স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে এবং কোন ধর্ম গ্রহণ না করে সব ধর্মের সার গ্রহণের মত মুক্ত মানুষ হয়েছিলেন এবং এটাই ছিল হায়াৎ মামুদের মতে আধুনিক বাঙালী হওয়ার জন্য যথার্থ কাজ– এ যথার্থ কাজটি করে রাজা রামমোহন রায় আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা।

রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা বানানোর এই হায়াৎ মামুদীয় সিদ্ধান্ত নতুন এবং মারাত্মক একটি বিষয়কে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। সেটা হলো, আধুনিক বাঙালীরা কোন ধর্মের নয়, বিশেষ কোন ধর্মের তারা অনুসারী হবে না, কোন ধর্মের কোন নির্দিষ্ট আচার-নিষ্ঠার গণ্ডির মধ্যে

প্রতিবেশী দেশটি অবশেষে বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সত্তা '৪৭-এর যে ভিত্তি, মুসলমানদের যে স্বাতন্ত্র চেতনা, তাকে ধ্বসে না দিলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ভূ-লুণ্ঠিত করা যাবে না। তাই এখন তারা প্রধান টার্গেট করেছে ইসলামকে, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র চেতনাকে। এই কারণেই প্রতিবেশী দেশটির প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী, পরবর্তী টার্গেট দেশের মাদ্রাসাগুলো এবং আলেম সমাজ। এবার নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে বিজয়ী হতে দেয়া হয়নি বা মেইনস্ট্রিমে আসতে দেওয়া হয়নি এই একই কারণে।

৫. ঐ

তারা নিজেদের আটকে রাখে না। সব ধর্মের সারৎসার নিয়ে নতুন কিছু করতে চায় তারা। যেহেতু রাজা রামমোহন রায় এই চরিত্রের ছিলেন এবং তিনি যেহেতু এই চিন্তারও জন্মদাতা, তাই তিনি আজকের বাঙালীর আদি পিতা। হায়াৎ মাহমুদ সাহেব ইতিহাসের আরেকটু পেছনে হাঁটলে অন্তত আরো একজন রামমোহনকে খুঁজে পেতেন। তিনি শ্রী চৈতন্য দেব। সুতরাং হায়াৎ মাহমুদ সচেতন হলে দুই পিতা পেয়ে যেতেন। অবশ্য দুই পিতা শুনতে কেমন লাগে। শ্রুতির এই অস্বস্তি দূর করার জন্য তিনি শ্রী চৈতন্য দেবকে আধুনিক বাঙালীর দাদা এবং রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক বাঙালীর পিতা বানাতে পারতেন।

আমার কাছে খুব বিস্ময়ের যে, হায়াৎ মামুদের বানানো আধুনিক বাঙালী ও তার পিতা চিন্তার গাঁজাখুরি বিষয়টা তার মাথায় ঢুকলো কি করে? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি হতে পারে এমনটা? শ্রী চৈতন্য ন্যারেটিভ, রামমোহন ন্যারেটিভ সৃষ্টিই হয়েছিল মুসলমানদের মগজ ধোলাইয়ের জন্য। যাতে করে নিজেদের ধর্ম-কর্ম সব শিকিয়ে তোলে মুসলমানরা শ্রী চৈতন্য ও রামমোহনদের মাথায় তুলে নেয়। অবশ্য মাথায় তোলার পর তারা দেখতো, যাদের তারা মাথায় তুলেছে তারা কেউ তাদের নিজেদের ধর্ম-কর্ম ছাড়েনি বরং তারা একেবারেই নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তখন আর এক ন্যারেটিভ তাদের মাথায় ঢুকতো, হিন্দুত্ব কোন ধর্ম নয় এটা আবহমান বাঙালীর, আবহমান ভারতীয়দের সনাতন কালচার (ইদানিং হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম নামে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে) এবং এই সনাতন কালচার গ্রহণ করলেই আধুনিক বাঙালী হওয়া যাবে যেমন রাজা রামমোহন রায়।

মুসলমানদের হিন্দু জাতি দেহে লীন করার নরম-গরম সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর শ্রী চৈতন্যদের সমন্বয়-চিন্তা (সত্য নাবায়ন সত্যপীর) মুখ ধুবড়ে পড়ার পর রামমোহনদের নামে এই আধুনিক ন্যারেটিভ উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। যার শিকার হয়েছেন আমাদের হায়াৎ মামুদরা। হায়াৎ মামুদদের জানা প্রয়োজন, রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ছিলেন এবং বেদানুসারী নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসেবে তিনি সবকিছু করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "একথা বিশেষভাবে স্মরণ করা উচিত রাজা রামমোহন রায় কখনো নিজেকে হিন্দু ব্যতীত অন্য কিছু ভাবেননি এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাকে নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলেছে। তাঁর আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্রহ্ম সভার অধিবেশনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ পাঠ করানো হতো এবং কোন অব্রাহ্মণের সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজা মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ করেছেন।[৬] রাজা রামমোহন রায়ের বেদ ব্রাহ্মণের অনুসরণ ও উপাসনার সাক্ষ্য খোদ রামমোহনের লেখাতেই রয়েছে। বলা হয়েছে, "সকলের সম্মতিক্রমে সাপ্তাহিক উপাসনার্থে একটি বাড়ি ভাড়া করা স্থির হইল। তদানুসারে উক্ত ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি

৬. An advanced History of India, Dr. R. C. Mazumdar, Page4-877

ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কার্য আরম্ভ হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইত। কার্যপ্রণালী এইরূপ ছিল, প্রথমে দুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতেন। তৎপরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীষ উপনিষদ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করিলে সঙ্গীতানান্তর সভা ভঙ্গ হইত।"[৭]

রামমোহনের ধর্মনিরপেক্ষ অথবা সকল ধর্মের গণ্ডির উর্ধ্বে উঠার দৃষ্টিকোণ বুঝাবার জন্য জনাব হায়াৎ মামুদ রবীন্দ্রনাথের একটা বক্তব্যকে দলিল হিসেবে এনেছেন। এই দলিলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানব সমাজের সর্ব প্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলন। এই ঐক্য তত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে।" এখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খুব ছোট একটা তত্ত্ব কথা বলেছেন। এর দ্বারা রামমোহনের পরিচয় ও দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃত হয় না। হায়াৎ মামুদ সম্ভবত অজ্ঞতাবশতই রবীন্দ্রনাথের সেই সব উক্তিকে সামনে আনেননি যা রামমোহনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচয়কে তুলে ধরেছে। 'ভারত পথিক রামমোহন রায়'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয় ঘোষণা একদিন এই ভারতবর্ষে যেমন অশংসায়িত বাণীতে বেদ-উপনিষদে প্রকাশ পেয়েছিল এমন আর কোথাও পায়নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খণ্ডিত, আচ্ছন্ন, অবরুদ্ধ, তখনই রামমোহন রায় পুনরায় নির্মাণ করে বহন করে আনলেন।..... রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্ম সাধনাকে নবীন যুগে উৎঘাটিত করেছিলেন।[৮] রবীন্দ্রনাথ এখানে রামমোহন রায়কে হিন্দু ধর্মের মহান সংস্কারক হিসেবে উপস্থিত করেছেন। 'মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়' ঘোষণাকারী 'বেদ-উপনিষদ' এর বাণী নানা কুসংস্কারে 'খণ্ডিত, আচ্ছন্ন, অবরুদ্ধ' হয়ে পড়লে রামমোহন রায় তা সংস্কারের মাধ্যমে পুনরায় নির্মাণ করে দেন। এই কথাকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন অরবিন্দ পোদ্দার। তিনি লিখেছেন, "তাঁর (রামমোহনের) চিন্তা ও ধ্যান হিন্দু সমাজকে গতিদান করেছে। ইংরেজ শাসন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে যে নতুন বিকাশ পথে চালিত করেছিল, রামমোহন তার উপযোগী হিন্দু সমাজ-মানস সৃষ্টি করে সে বিকাশ ধারাকে সফল করতে চেয়েছিলেন।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ পোদ্দার এখানে যে কথা বলেছেন, এটাই রাজা রামমোহন রায়ের সত্যিকারের পরিচয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে রাজা রামমোহন রায় পুনরায় বেদ-উপনিষদ এর শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং সেসময় এর উৎকট প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের একজন ইতিহাসকার নাজিরুল ইসলাম রামমোহনের কাজ সম্পর্কে লিখেছেন, "বর্ণাশ্রম, সতীদাহ, বিধবা বিবাহ সমস্যা, বহু

---

৭. 'উপনিষদ', রাজা রামমোহন রায়, পৃষ্ঠা-৩৭, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।
৮. 'রবীন্দ্র কাব্য ও উপনিষদ', ডঃ অরুনা মাধব, কলকাতা, পৃ. ২৩, ২৪
৯. 'উনবিংশ শতাব্দীর ভারত পথিক', অরবিন্দ পোদ্দার, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৮

পূজা, মূর্তিপূজা, প্রভৃতি বহু অভ্যাসকে যখন খ্রিস্টান পাদরীরা প্রতিনিয়তই ঘা দিতে লাগিলেন এবং বহু হিন্দুকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন– তখন হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইহাদেরই একজন রাজা রামমোহন রায়।"[১০]

বস্তুত: রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মকর্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম ধর্ম কুসংস্কার আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের এই সংস্কৃত রূপ। হিন্দু ধর্মে যেসব দোষ পাদরীরা বড় করে দেখাতেন, সেই সমস্ত দোষ রাজা রামমোহন রায় তার হিন্দু ধর্মের চর্চ্চা থেকে বাদ দিয়েছেন। এইভাবে রাজা রামমোহন রায় হিন্দুদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, যেমন চেয়েছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব হিন্দুদের মুসলমান হওয়া বন্ধ করতে হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যবস্থা (বৈষ্ণব পন্থা) প্রবর্তনের মাধ্যমে। রামমোহন যে বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার রচনা করেছেন তা একান্তভাবেই হিন্দু ধর্মের সংস্কারের লক্ষ্যেই। রামমোহন রায়ই বেদের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন। তার রচিত 'বেদান্তসার', 'তলপকার উপনিষদ'- 'ঈশোপানিষৎ', 'কষ্টোপানিষৎ', 'মাণ্ডোক্যো-পানিষদ', 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকে সম্বাদ', 'গায়ত্রী অর্থ', সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', ব্রাহ্মণ সেবধী ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ', 'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'প্রার্থনা পত্র', 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ', 'গায়ত্র-পরমোপাসনা বিধানং', 'ব্রহ্মোপাসনা', 'ব্রহ্মসঙ্গীত', প্রভৃতি সব গ্রন্থই তার হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও অগ্রগতিতে অমূল্য সহায়তা দান করেছে।

হায়াৎ মামুদদের জানা প্রয়োজন, রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ছিলেন এবং বেদানুসারী নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসেবে তিনি সবকিছু করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "একথা বিশেষভাবে স্মরণ করা উচিত রাজা রামমোহন রায় কখনো নিজেকে হিন্দু ব্যতীত অন্য কিছু ভাবেননি এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাকে নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলেছে। তাঁর আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্রহ্ম সভার অধিবেশনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ পাঠ করানো হতো এবং কোন অব্রাহ্মণের সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজা মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ করেছেন।

১০. 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস', আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ নাজিরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৫৪

সুতরাং রামমোহনের সকল তৎপরতা ও সাহিত্যকর্ম সামনে রেখে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাজা রামমোহন রায় আজকের আধুনিক হিন্দু মানস, হিন্দু সমাজের জন্মদাতা– আধুনিক আদি পিতা। আধুনিক হিন্দুদের এই আধুনিক আদি পিতা রামমোহনকেই আমাদের হায়াৎ মামুদ সাহেব আধুনিক বাঙালীর আদি পিতা রূপে অভিহিত করেছেন। তিনি আধুনিক বাঙালীকে কি হিন্দু মনে করেন? এত বড় দায় তাঁর উপর চাপাতে চাই না। তাঁর বিশ্বাস ও ধর্ম নিয়ে কোন প্রশ্ন না তুলেই আমি বলতে চাই, জাতি পরিচয় বিষয়ে তিনি বিভ্রান্তিতে আছেন। বাঙালী নামের কোন একক সত্তা যে বাংলাদেশে নেই, জাতি-পরিচয় সচেতন এবং অন্তত ১০০ বছরের ইতিহাস যারা জানেন তাদের কাছে এটা অজানা নয়। '৪৭-এর বাংলা বিভাগ এটা শেষ বারের মতো প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মুসলিম বাঙালী এবং হিন্দু বাঙালী দুই ভিন্ন জাতি। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে সব ধর্মের, লোকদের একই দেশের নাগরিক হওয়ার সুযোগ আছে। যেমন বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলেই আমরা বাংলাদেশী। একই রাষ্ট্রের সমান নাগরিক আমরা। হায়াৎ মামুদ ভুল করেছেন। বাঙালীকে এক জাতি ঠাওরে এবং হিন্দু বাঙালীর পিতা রামমোহনকে বাঙালী মুসলমানদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে। হায়াৎ মামুদের মতো একুশে পদক জয়ী, বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পুরুষ্কারের পদক গলায় ঝুলানো বুদ্ধিজীবীরা যখন এই কর্ম করেন, তখন সেটাকে তাদের ভুল বলা হয় না, ভুল বলা যায় না। এটা তাদের সাংস্কৃতিক বিকৃতি এবং বুদ্ধিভিত্তিক অধঃপতন। আমাদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী এই বুদ্ধিভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের শিকার। তারা আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ইসলামকে মৌলবাদ আখ্যা দিয়ে একে সামনে থেকে সরানোর প্রয়াসে রত রয়েছেন।

এই বিকৃতি ও অনাচার শুধু আমাদের সাংস্কৃতিক সংকট নয়, এটা আমাদের রাষ্ট্রসত্তার সংকট। ১৯৪৭-এ একটা জাতিসত্তাকে নিরাপদ করার জন্য একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-সত্তার জন্ম হয়। তখন ভারতীয় হিন্দুদের এক ভারত, এক জাতি, এক রাষ্ট্র স্লোগানের জবাবে ভারতীয় মুসলমানরা বলল, ভারতে এক জাতি নয়, আরো জাতি আছে। মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি এই জাতির নিরাপত্তার জন্য আমাদের রাষ্ট্র চাই। এ দাবিরই ফল ৪৭-এ আমরা একটা রাষ্ট্র সত্তার মালিক হওয়া। সেই রাষ্ট্র-সত্তা তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ। সেই রাষ্ট্র-সত্তাই ১৯৭১-এ হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সুতরাং বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সত্তা এই বিশ্বাসগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যে, মুসলমান হিসেবে আমরা আলাদা, এই আলাদা জাতির নিরাপত্তা, বিকাশ ও উন্নয়নের জন্যেই এই আলাদা রাষ্ট্র। এই ভিত্তির কথা যদি আমরা ভুলে যাই, তা হবে আমাদের রাষ্ট্র-সত্তার জন্য এক ভয়াবহ সংকট। সংকট হবে কারণ, রাষ্ট্র-সত্তার ভিত্তিকে যদি আমরা ভুলে যাই, রাষ্ট্রীয় সীমানার বিলয় ঘটতে পারে। এই বিলয় ঘটাবার লক্ষ্যেই আমাদের প্রতিবেশী বড় দেশটি সব দিক থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ঐ দেশের পলিসি মেকাররা ৪৭ কে মেনে নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত এই আশায় যে, মুসলমান হওয়ার আবেগ নিয়ে তারা যে আলাদা রাষ্ট্র নিচ্ছে অর্থনৈতিক ও নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে সেটা ত্যাগ করে আবার এসে তারা ভারত রাষ্ট্রে যোগ

দিবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। একাত্তরে হবেই ধরে নিয়েছিল তারা, আয়োজনও নানাদিকে পাকাপোক্ত করেছিল। কিন্তু সেটাও তাদের কাজে আসেনি। সব সমস্যা মোকাবেলা করেই বাংলাদেশের মানুষ দ্রুত সামনে এগোচ্ছে। হতাশ প্রতিবেশী দেশটি অবশেষে বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সত্তা '৪৭-এর যে ভিত্তি, মুসলমানদের যে স্বাতন্ত্র চেতনা, তাকে ধ্বসে না দিলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ভূ-লুণ্ঠিত করা যাবে না। তাই এখন তারা প্রধান টার্গেট করেছে ইসলামকে, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র চেতনাকে। এই কারণেই প্রতিবেশী দেশটির প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী, পরবর্তী টার্গেট দেশের মাদ্রাসাগুলো এবং আলেম সমাজ। এবার নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে বিজয়ী হতে দেয়া হয়নি বা মেইনস্ট্রিমে আসতে দেওয়া হয়নি এই একই কারণে। শোনা যাচ্ছে, বিএনপিকে ক্ষমতায় আনা হয়েছে সেসব শর্তের মধ্যে জামায়াতকে কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে না এটাও রয়েছে।

আমাদের প্রতিবেশী বড় দেশটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে ইসলামের প্রভাব বিলোপ করার জন্য নানামুখী কাজ করছে। আর আমাদের হায়াৎ মামুদের মতো বুদ্ধিজীবীরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বতন্ত্র চেতনা মুছে দেয়ার কাজ একইভাবে করে যাচ্ছে। এই কারণেই বিএনপির সংস্কৃতি মন্ত্রী বৈশাখের 'আনন্দ শোভাযাত্রা' ও 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র মধ্যে পার্থক্য দেখেন না এবং হায়াৎ মামুদের মতো বুদ্ধিজীবীরা বৈদেশিক ব্রাহ্মণ রাজা রামমোহন রায়কে বাঙালী জাতির আদি পিতা বানান। আমাদের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বড় দুঃখ এখানেই। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জাতীয় স্বাতন্ত্র চেতনায় একটা মাইলস্টোন হিসেবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে দাঁড় করিয়েছিলেন। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা এক বাংলা'– ভারতীয় এই আধিপত্যবাদী স্লোগানের প্রবক্তাদের এপার বাংলার পরিচয় বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেই জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে সামনে এনেছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জিয়াউর রহমানের দল আজকের বিএনপি ভুলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। জিয়াউর রহমানের সন্তান এবং বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মুখে নির্বাচনের আগে বা পরে তার কোন নীতি-নির্দ্ধারণী ভাষণে বা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শব্দ উচ্চারিত হতে শুনিনি। জানিনা এটাও ভারতীয় কোন তৎপরতার ফল কিনা। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মতো পরিচয় সংকটে আমাদের রাজনীতিও। ■

'মাসিক পৃথিবী'

নিজে পড়ুন, অন্যকে

পড়তে উৎসাহিত করুন

ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া (রহ.)

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

যে সকল মহা মনিষী অনন্য জ্ঞান-গবেষণা, বহুমুখী কর্মকান্ড এবং অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য উজ্জল নক্ষত্রের মত চিরভাস্বর হয়ে আছেন, তাদের অন্যতম একজন মুহাম্মদ ইবন আবি বাকর; যিনি 'আল্লামা হাফিজ ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টিয় চর্তুদশ শতাব্দীর এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। নানা মুখী জ্ঞান-গবেষণা এবং জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তাঁর সরব পদচারণার কারণে তিনি সমসাময়িক কালে এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, সুসাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক এবং নির্ভিক এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, 'আকাইদ, দর্শন, ইতিহাস, সমরনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইসলামের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে বিষয়ে তিনি কলম ধরেননি। তাঁর রচিত একশতটিরও বেশী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যার কোন কোনটি বহু খন্ডে বিভক্ত বিশাল ভলিয়মের।

কিন্তু দু:খের বিষয় হলো এ মহান চিন্তা নায়কের জীবনী, চিন্তাধারা ও সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে 'আরব জাহানের বাইরের লোকেরা খুব একটা অবগত নয়। অথচ মুসলমানদের বর্তমান আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর অবলম্বিত চিন্তা, নীতি ও কর্মধারা প্রতিফলিত হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষত: এ অঞ্চলের মুসলমানগণ বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত, অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিজাতীয় সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষ্যিত হয়। অধিকন্তু সমাজের অনেক ক্ষেত্রে কুসংস্কার, শিরক, বিদ্'আত ইত্যাদি প্রচলিত । সে ক্ষেত্রে 'আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের চিন্তা-ধারা ও সংস্কার সমূহ মুসলমানদেরকে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব বলয় হতে মুক্ত করে নির্ভেজাল ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি আকৃষ্ট করতে সাহায়ক হবে।

তেমনিভাবে তাঁর উসূলে দ্বীন ও আহকামে শরী'আহর মূলনীতিসমূহ, জিহাদ ও যুদ্ধনীতি এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা দানে সহায়ক এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী জনগোষ্ঠীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হবে বলে আমরা মনে করি।

এ নিবন্ধে আমরা এ মহামনিষীর জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব-ইনশাআল্লাহ।[১]

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা 'ইবনুল কায়্যিম : জীবন চিন্তাধারা ও সংস্কারসমূহ গ্রন্থটি পাঠ করা যেতে পারে।

ইবনুল কায়্যিম (রহ)-এর পরিচয়

নাম : তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবন আবি বাকর ইবন আয়্যুব ইবন সা'আদ ইবন হারিয ইবন যায়নুদ্দীন মাক্কী আয্যুর'ঈ আদ্ দামিশ্কী হাম্বলী।[২] তাঁর লকব বা উপাধি ছিল 'শামসুদ্দীন' এবং কুনিয়াত বা উপনাম ছিল 'আবু 'আব্দুল্লাহ'। তিনি ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া নামেই সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তাঁর উর্ধতন পূর্বপুরুষ 'হারিয' এর নামের ব্যপারে জীবনী লেখকগণের তিনটি মত পাওয়া যায়।

(১) হারিয (حريز) (২) জারীর (جرير) (৩) জারীয (جريز)।

এ ব্যাপারে বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ 'ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া, হায়াতুহু ওয়া আছারুহু' গ্রন্থে বলেন, (حريز) هو الاقرب ان। "অধিকতর বিশুদ্ধ কথা হল তিনি ছিলেন হারিয।"[৩]

ইবনুল কায়্যিম এর উর্ধতন পূর্বপুরুষ "যায়নুদ্দীন মাক্কী"র নাম অন্য কোন জীবনী লেখক উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র ইবন হাজার আসকালানী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আদ্দুরারুল কামিনা'তে ইবনুল কায়্যিমের ভাই 'আব্দুর রাহমানের জীবনীতে এ নামটি উল্লেখ করেছেন।[৪]

যুর'ঈ, দামিশকী ও হাম্বলী নামে পরিচিত হওয়ার কারণঃ

যুর'ঈ শব্দটি যুরা' (زرع) নামক স্থানের সাথে সম্পর্কিত করে রাখা হয়েছে। এটা দামিশকে'র পার্শ্ববর্তী হাওরান প্রদেশের একটি গ্রামের নাম।[৫] এ গ্রামই ইবনুল কায়্যিমের পূর্বপুরুষের জন্মস্থান। এর সাথে সম্পর্কিত করেই তাকে 'আয্ যুর'ঈ' বলা হত। পরবর্তীকালে তারা সেখান থেকে দামিশকে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করেন। একারণেই তাকে দামিশকী বলা হয়। আর ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বলে তাদেরকে হাম্বলী বলা হয় ।

জন্মস্থান : ইবনুল কায়্যিমের জন্মস্থান যুরা' না দামিশক এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়না। মুরাগী স্বীয় গ্রন্থ 'তাবাকাতুল উসূলীয়্যিন' এ তাঁর জন্মস্থান দামিশক বলেই উল্লেখ করেছেন। তার মতে ইবনুল কায়্যিমের পূর্বপুরুষগণ যুরা'র অধিবাসী ছিলেন।

---

২. ইমামুদ্দীন ইসমা'ঈল ইবন কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরূত : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭খৃ.) খ. ১৪, পৃ, ২৩৪; দি এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম (লিডেন, লন্ডন : নিউ ইডিশন, লোজাক এন্ড কোং, ১৯৭৯ খৃ,) খ. ৩, পৃ. ৮২১; মুহাম্মাদ ইবন আবি বাকর (ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া), ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন আর রাব্বিল 'আলামীন (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছ আল 'আরবী, ১৯৬৯ খৃ.) খ. ১, ভূমিকা, পৃ. (ص) ও যাদুল মা'আদ ফি হাদ্ইয়ে খাইরিল 'ইবাদ (মিশর : আল মাতবা'আতুল মিসরিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯২৮ খৃ.) খ. ১, ভূমিকা, পৃ. ২; মুহাম্মাদ ইবন আবি বাকর ইবন নাসিরুদ্দীন, আর রাদ্দুল ওয়াফির (বৈরূত : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি.) পৃ. ৬৮; বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া: হায়াতুহু ওয়া আছারুহু (রিয়াদ : মাতাবি'উ দারিল হিলাল লি অফসেট, ১৯৮০ খৃ.) পৃ. ৭।

৩. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ১, ভূমিকা, পৃ. (ص); বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৪. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৫. গ্রামটির নামের ব্যপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। আহমাদ 'আবীদ বলেন, এটা সেই গ্রাম যা বর্তমানে আয্রা' (ازرع) নামে পরিচিত। পূর্বে এর নাম ছিল যুর (زر)। আবার কখনও যুরাহ্ (زره) নামেও এটিকে উল্লেখ করা হত। ইয়াকুত স্বীয় গ্রন্থ মু'জামুল বুলদানে স্থানটিকে যুরা (زرا)নামে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে নামটি রূপান্তরিত হয়ে যুর'আ (زرع)হয়েছে, যা বর্তমানে আযরা' (ازرع) নামে পরিচিত। কিন্তু আযরা' নামটি বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি বলে মনে হয়। কারণ কোন জীবনী লেখকই তাকে আযরা'ঈ বলে উল্লেখ করেননি। এ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ১, মুকাদ্দামা, পৃ. (ص); বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।

পরবর্তীতে হিজরত করে তারা দামিশকে চলে যান এবং সেখানেই তাঁর জন্ম হয়।[৬] এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামে তাঁর জন্মস্থান দামিশ্ক বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] সায়্যিদ হাসান 'আলী নদবী বলেন, "তিনি দামিশ্কে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানেই জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।"[৮]

জন্ম তারিখ : ইবনুল কায়্যিম ৭ সফর, ৬৯১ হিজরী, ২৯ জানুয়ারী ১২৯২ খৃ. জন্ম গ্রহণ করেন।[৯] তাঁর জন্ম তারিখের ব্যাপারে সকল জীবনী লেখক একমত পোষণ করেছেন। তবে ইংরেজী সন তারিখ শুধুমাত্র এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য লেখকগণ শুধুমাত্র হিজরী সন ও তারিখ উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া নামে খ্যাত হওয়ার কারণ

সকল মহলে তিনি 'ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া' বা 'ইবনুল কায়্যিম' নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। কায়্যিম আল জাওযিয়া হলো তাঁর পিতা আবু বাকর ইবন আয়্যুব আয্ যুরঈ'র উপাধি। যেহেতু তাঁর পিতা আবু বাকর দীর্ঘদিন দামিশ্কে অবস্থিত 'জাওযিয়া' মাদরাসার কায়্যিম (قيم) বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, সেহেতু তিনি এ উপাধিতে ভূষিত হন এবং এ কারণেই তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া নামে পরিচিতি লাভ করে।[১০] মুহাম্মাদ ইবন আবি বাকরও এ কারণেই 'ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীতে অনেকে সংক্ষিপ্ত করে তাকে 'ইবনুল কায়্যিম' বলে আখ্যায়িত করেন।[১১]

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'জাওযিয়া' মাদরাসার পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনের কারণেই তাঁর পিতা 'কায়্যিম আল জাওযিয়া' উপাধিতে ভুষিত হন।

মাদরাসা-ই-জাওযিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জাওযিয়া মাদরাসাটি দামিশ্ক নগরীতে অবস্থিত হাম্বলী মাযহাবের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইবনুল জাওযী।[১২] তাঁর নামের সাথে সম্পর্কিত করেই মাদরাসাটির নামকরণ করা হয়েছিল 'মাদরাসা-ই-জাওযিয়া'। 'জাওযী' বসরার একটি মহল্লার নাম। এ মহল্লার সাথে সম্পর্কিত করেই তাকে 'ইবন জাওযী' বলা হত।[১৩]

---

৬. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৯–১০।
৭. The Encyclopaedia of Islam, vol, 3, p.821.
৮. সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, তারিখে দাওয়াত ওয়া 'আযিমত (লক্ষ্ণৌ : মাজলিসে তাহকিকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, ৪ সং, ১৯৭৯ ইং) খ. ২, পৃ. ৩৮৪।
৯. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৩৪; মুহাম্মাদ ইবন আবি বাকর, আর রাদ্দুল ওয়াফির, পৃ. ৬৮; ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, মুকাদ্দামাহ্ পৃ. (ز); আবুল ফালাহ্ 'আব্দুল হাই ইবন 'ইমাদ, শাজারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব (বৈরুত : দারুল মাসিরাহ্, ২ সং, ১৯৭৯ ইং) খ. ৬, পৃ. ১৬৮; বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত পৃ ৯; The Encyclopaedia of Islam, vol, 3, p.821.
১০. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; The Encyclopeadia of Islam vol.3, p. 821; সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮৪।
১১. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪। কোনো কোনো পুস্তকে তাকে 'ইবন জাওযী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভূল। কারণ 'ইবন জাওযী' হলেন 'আব্দুর রাহমান ইবন 'আলী আল কুরশী, যার মৃত্যু হয়েছে ৫৯৭ হিজরীতে। প্রাগুক্ত।
১২. তিনি হলেন মুহিউদ্দিন ইউসুফ ইবন আবিল ফারাজ 'আব্দুর রাহমান ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন 'উবায়দুল্লাহ ইবন জাওযী (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) প্রাগুক্ত পৃ. ১২। ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন এর ভূমিকায় তার নাম মুহিউদ্দিন ইবন হাফিজ আবিল ফারা') ابي الفرع (ইবন জাওযী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খ. ১, পৃ. (ق)।
১৩. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত পৃ. ১২।

মাদরাসাটির অবস্থান

এ মাদরাসাটি দামিশ্‌কে'র 'বাজুরিয়া' এলাকায় অবস্থিত, যার পুরাতন নাম ছিল 'সুকুল কাম্‌হ' (سوق القمح)[২] কামহের (গমের) বাজার। এ এলাকাটি ১৩২৭ হিজরীতে মহকুমায় রূপান্তরিত হয়।[১৪]

এ প্রসঙ্গে 'আব্দুল কাদির ইবন আহমাদ ইবন মোস্তফা বাদরান (মৃত্যু ১৩৪৬ হি.) বলেন,

تقع هذه المد رسة بالبزورية المسمى قديما سوق القمح وقد اختلس جيرانها معظمها و بقى منها الان بقية ثم صارت محكمة الى سنة ١٣٢٧ من الهجرة وهى الان مقفلة لا ند رى ما يصنع بها الزمان فيما بعد

মাদ্‌রাসাটি 'বাজুরিয়া'–যার পুরাতন নাম 'সুকুল কাম্‌হ'–এ অবস্থিত। এর অধিকাংশ স্থান প্রতিবেশীরা জবর দখল করে নিয়েছে এবং অবশিষ্টাংশ এখনো বর্তমান রয়েছে। ১৩২৭ হিজরীতে এটা মহকুমায় রূপান্তরিত হয়। এখন সেটা তালাবদ্ধ। পরবর্তী সময়ে এর প্রতি কি আচরণ করা হয়েছে, তা আমাদের জানা নেই।"[১৫]

এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আহমাদ 'আবীদ উল্লেখ করেন, "নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত (কত দিন তা উল্লেখ নেই) বন্ধ থাকার পর 'জাম্‌'ইয়াতুল আস'আফ আল্‌ খাইর' এটা খুলে দেয় এবং শিশুদের পাঠশালায় রূপান্তরিত করে, যা এখন পর্যন্ত সেভাবেই রয়েছে।"[১৬]

মাদরাসাটির পরবর্তী অবস্থা জানা যায় মুহাম্মাদ মুসলিম আল গানিমীর বর্ণনা থেকে। তিনি বলেন,

ثم انها احترقت سنة ١٩٢٥ م اثناء الثورة السورية على الافرنسيين ثم اعيد بناءها الان

"অতঃপর ১৯২৫ খৃ. সুরিয়াদের আক্রমণের সময় তা পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং তারপর তা পূণরায় নির্মাণ করা হয়।"[১৭]

এ মাদরাসাটিতেই তদানিন্তন দামিশকের প্রধান বিচারপতির বিচারালয়ের কাজ সম্পাদন করা হত।

এ সম্পর্কে এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে বর্ণনা করা হয়েছে :

The djawzia Madrasah, which served as a court of law for the Hambali kadiul kudat of Damascus.

"জাওযিয়া মাদরাসটি দামিশকের হাম্বলী মাযহাবের কাজিউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি) এর বিচারালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত।"[১৮]

---

১৪. ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈনের মুকাদ্দামায় এটাকে সুকুল ফাতহ বা ফাত্‌হির বাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খ. ১, পৃ. (ق)।

১৫. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩, (মুনাদাতুল আতলাল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২২৭ পৃ. এর উদ্ধৃতিতে।)

১৬. ইবনুল কায়্যিম এর 'রওজাতুল মুহিব্বীন' এর মুকাদ্দামায় আহমাদ 'আবীদ এ কথা উল্লেখ করেছেন। এ মুকাদ্দামা তিনি ১৩৪৯ হিজরীতে লিখেন। বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩, টীকা ৩।

১৭. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩, (মুহাম্মাদ মুসলিমের লিখিত বই ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১০০ এর উদ্ধৃতিতে। বইটি প্রথম ছাপা হয় ১৩৯৭ হিজরীতে।)

১৮. The Encyclopaedia of Islam, vol 3, p. 821

ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়ার পরিবার

লালন-পালনসহ সব কিছুর হাতে খড়ি পরিবারেই হয়ে থাকে। এ জন্য কোন ব্যক্তির জীবনে তার পরিবারের প্রভাব অনস্বীকার্য। ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়া পরিবারে যাদের মাঝে লালিত পালিত হয়েছেন, তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল:

১. তাঁর পিতা : তাঁর পিতা শায়খ আবু বাকর ইবন আয়্যুব ইবন সা'আদ আয্ যুর'ঈ ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট 'আলিম এবং জাওযিয়া মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক। তিনি অত্যন্ত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, সৎ, যোগ্য ও 'ইবাদাতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। সততা ও দক্ষতার কারণে তিনি সকলের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইবন কাছীর বলেন, كان رجلا صالحا متعبدا "তিনি একজন সৎ, যোগ্য ও 'ইবাদাতগুজার ব্যক্তি ছিলেন।"[১৯]

তিনি অনেক মূল্যবান বই পুস্তক রচনা করেছেন। বিশেষ করে ফারায়িজ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। ইবনুল কায়্যিম তাঁর পিতার নিকট থেকেই ফারায়িজ শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন।[২০] ৭২৩ হিজরীর ২৯ শে জিলহজ্জ রবিবার রাত্রে মাদরাসা-ই জাওযিয়াতেই তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। জোহর নামাযের পর জানাযা শেষে বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় অসংখ্য লোক অংশগ্রহণ করেন এবং সকলেই তাঁর প্রসংসা করেন।[২১]

২. তাঁর ভ্রাতা যায়নুদ্দীন : আবুল ফায়িজ যায়নুদ্দীন 'আব্দুর রাহমান ইবন আবি বাকর ছিলেন তাঁর দুই বৎসরের ছোট। তিনি ৬৯৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্রজ ইবনুল কায়্যিমের অধিকাংশ শিক্ষক তারও শিক্ষক ছিলেন। ৭৬৯ হিজরীর ১৮ই জিলহজ্জ রবিবার রাত্রে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি দামিশ্কে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে বাবুস্ সাগীরের কবরস্থানে দাফন করা হয়।[২২]

৩. ভ্রতুষ্পুত্র : ইবনুল কয়্যিমের ভাই যায়নুদ্দীনের পুত্র, যার পূর্ণ নাম ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন যায়নুদ্দীন। তিনি চাচা ইবনুল কায়্যিমের অধিকাংশ লেখাকে গ্রহণ করেন। ১৫ই রজব, ৭৯৯ হিজরী, শনিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২৩]

৪. পুত্র 'আব্দুল্লাহ : 'আব্দুল্লাহ ইবন শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ, শারফুদ্দীন ও জামাল উদ্দীন এ দু' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৭২৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও স্মরণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সুরা আ'রাফ মুখস্ত করতে তার মাত্র দু'দিন লেগেছিল। ৭৩১ হিজরীতে মাত্র ৯ বৎসর বয়সে উপনীত হলে তিনি কুরআন

---

১৯. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৯৫।
২০. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
২১. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১১০; আহমাদ ইবন 'আলী ইবন হাজার 'আসকালানী, আদ্ দুরারুল কামিনা (হায়দারাবাদ : দায়েরাতুল মা'আরিফ আল 'উছমানিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬ ইং) খ. ১, পৃ. ৫২৭।
২২. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
২৩. প্রাগুক্ত।

তিলাওয়াতের মাধ্যমে নামায আদায় করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর উপরই সাদ্‌রিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষাদানের ভার অর্পণ করা হয়। জীবনী লেখকগণ তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[২৪] পিতার মতই তিনি বিদ্‌'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ইবন কাছীর বলেন, "দামিশ্‌কের জামে' মসজিদে ১৫ই শা'বানের রাত্রিতে প্রচলিত বিদ্‌'আতকে তিনিই রহিত করেন।"[২৫] তিনি ৭৫৬ হিজরীর শা'বান মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[২৬]

৫. পুত্র ইব্‌রাহীম : ইবনুল কায়্যিমের অপর পুত্র বুরহানুদ্দীন ইব্‌রাহীম ইবন শামসুদ্দীন ছিলেন একজন বিজ্ঞ নাহুবিদ ও নির্ভরযোগ্য ফকীহ্‌। তিনি ৭১৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে তিনি বিদ্যার্জন করেন। তিনিও সাদ্‌রিয়া মাদরাসায় পাঠদান করেন এবং সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ফাত্‌ওয়া প্রদান করেন। তিনি তাঁর পিতার তরীকার উপর কায়িম ছিলেন। নাহুশাস্ত্রে তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইবন মালিকের আল্‌ফিয়া গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেন এবং নাম দেন ইরশাদুস্‌ সালিক ইলা হাল্লি আল্‌ফিয়া ইবন মালিক। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় এক লক্ষ দিরহামের সম পরিমান সম্পদ তিনি রেখে যান।[২৭]

তিনি 'ইখ্‌তিয়ারাতে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন, যা ১৩৩০ হিজরীতে দামিশকে মুদ্রিত হয়।[২৮] ৭৬৮ হিজরীতে সফর মাসের শেষ জুম'আর দিন ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 'আসরের পর জানাযা শেষে বাবুস সাগীরের কবরস্থানে পিতার নিকটে তাকে দাফন করা হয়।[২৯]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনুল কায়্যিমের গোটা পরিবারই ছিল সুশিক্ষিত এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা দেয়ার পর বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ বলেন,

هؤلاء هم ال قيم الجوزية رحمهم الله تعالى بيت علم و فضل و صلاح و تقوى الاب و ولداه و احفادهم فهو بيت مسلسل بالذهب

"এঁরাই হলেন কায়্যিম আল জাওযিয়ার পরিবার-পরিজন। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। তাঁর গৃহটি ছিল জ্ঞান, দক্ষতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও খোদাভীতিতে ভরপুর। পিতা, পুত্রদ্বয় এবং পৌত্রগণের এই গৃহটি ছিল স্বর্ণখন্ডে গ্রথিত এক মাল্য বিশেষ।"[৩০]

---

২৪. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ইবন হাজার 'আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭১-৭২।
২৫. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২০২।
26. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ইবন হাজার 'আসকালানী, আদ্‌ দুরারুল কামিনা, খ. ৩, পৃ. ৭২।
২৭. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮; ইবন হাজার 'আসকালানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫; বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
২৮. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
২৯. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩৫৮। ইবন হাজার 'আসকালানী, আদ্‌ দুরারুল কামিনাতে তার মৃত্যুর তারিখ ৭৬৭ হিজরীর সফর মাস বলে উল্লেখ করেছেন। খ. ১, পৃ. ৬৫৭।
৩০. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

শৈশব ও কৈশর

শিশু ইবনুল কায়্যিম তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে পারিবারিক পরিবেশে লালিত পালিত হন। তাঁর পারিবারে ছিল সুশিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই ইবনুল কায়্যিম বেড়ে উঠেন। এরই প্রভাবে তিনি সৃজনশীল চিন্তা, পথ প্রদর্শনকারী নেতৃত্ব, অত্যাশ্চার্য স্মরণ শক্তি এবং পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ব্যক্তিস্বত্ত্বার অধিকারী হতে সক্ষম হন। এর ফলেই তিনি উত্তম গুণাবলী, উন্নত নৈতিক চরিত্র, সুপ্রসংশিত ও সুখ্যাতি সম্পন্ন এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

এব্যাপারে তাঁর অন্যতম ছাত্র ইবন কাছীরের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

"৭১২ হিজরীতে শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়ার মিশর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি (ইবনুল কায়্যিম) তাঁর সাহচার্য গ্রহণ করেন এবং শায়খের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করেন, যদিও ইতোপূর্বে তিনি জ্ঞান অন্বেষণেই মশগুল ছিলেন। রাত্রি-দিন জ্ঞানান্বেষণে কঠোর সাধনার ফলে তিনি জ্ঞানের অসংখ্য বিষয়ে অনন্য হয়ে উঠেন।"[৩১]

ইবন 'ইমাদ বলেন, "তিনি শায়খ তাকিউদ্দীনের সঙ্গী হন এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন।"[৩২]

এ প্রসঙ্গে The Encyclopaedia of Islam- এ বলা হয়েছে,

He was from 713/1313 the most famous pupil of Ahmed Ibne Taymiyya, all of whose idia He can be said to have absorbed and whose work He helped to popularize.

"তিনি ৭১৩ হিজরী (১৩১৩ খৃ.) থেকে আহমদ ইবন তাইমিয়ার প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। বলা যায়, তিনি তার সকল চিন্তা ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার কাজকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছিলেন।"[৩৩]

দি এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম এর এ উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবনুল কায়্যিম শুধু তাঁর শিক্ষক ইবন তাইমিয়ার নিকট থেকে বিদ্যা শিক্ষাই করেননি, বরং তিনি তাঁর চিন্তাধারারও ধারক-বাহক ছিলেন এবং তাঁর কর্মসূচী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার, প্রসার ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ ব্যাপারে সায়্যিদ সাবিক ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন এর ভূমিকায় বলেন,

"৭১২ হিজরীতে ইবন তাইমিয়ার সাথে সাক্ষাতের পর তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হন এবং যতদিন তিনি (ইবন তাইমিয়া) জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর সাহচার্য ও ছাত্রত্ব অবলম্বন

---

৩১. ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৩৪; যহীর আশ্ শাবীশ, তাওজীহুল মাকাসিদ ওয়া তাসহীহুল কাওয়া'ঈদ ফি শারহি ইবনিল কায়্যিম (বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ২ সং, ১৪০৬ হি.) পৃ. ৬।

৩২. ইবন 'ইমাদ, শাজারাতুয্ যাহাব, খ. ৬, পৃ. ১৬৮।

৩৩. The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 821.

করেন, তাঁর সাথে জিহাদে সর্বাত্মক সাহায্য করেন এবং তাঁর মাযহাবের পূর্ণ সহযোগিতা করেন। ৭২৮ হিজরীতে তাঁর শিক্ষকের মৃত্যুর পর তিনি জিহাদের ঝান্ডা বহনের দায়িত্ব স্বীয় কাঁধে তুলে নেন।"[৩৪]

ইবনুল কায়্যিমের শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষা

অতি অল্প বয়সেই তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং পিতার নিকটেই তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। এ ব্যাপারে সায়্যিদ সাবিক বলেন,

و نشأ فى بيت علم و فضل و تلقى علومه الاولى عن ابيه

"জ্ঞান ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহেই তিনি বড় হন এবং প্রথম শিক্ষা তাঁর পিতার নিকট থেকেই গ্রহণ করেন।"[৩৫]

জীবনী লেখকদের মতে ৭ বৎসর বয়সেই তিনি বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ আবু যায়িদ বলেন,

وانبرى للطلب فى سن مبكر و على وجه التحد يد فى السابعة من عمره

"ছোট বেলাতেই তিনি বিদ্যা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, তিনি সাত বৎসর বয়সেই বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।"[৩৬] ছোট বেলায় তিনি পিতা ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকের নিকট থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনের শিক্ষকদেরর মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিহাব আল 'আবির (মৃত্যু ৬৯৭ হি.) এবং আবুল ফাতাহ বা'লাবাক্কী (মৃত্যু ৭০৯ হি.)।[৩৭]

ইবনুল কায়্যিমের জন্ম ৬৯১ হিজরীতে। তাঁর প্রথম শিক্ষক শিহাব আল 'আবির [৩৮] মৃত্যুবরণ করেন ৬৯৭ হিজরীতে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ৭ বৎসর বয়সেই পড়া লেখা শুরু করেছিলেন। আবুল ফাতাহ বা'লাবাক্কীর নিকট তিনি আল্‌ফিয়াহ্ ইবন মালিকসহ বিভিন্ন নাহু শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং সেগুলো তাকে পাঠ করে শুনান।[৫] আল্‌ফিয়াহ্ এবং অনুরূপ অন্যান্য কিতাব অধ্যায়ন করা 'আরবী ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন ব্যতীত সম্ভব নয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনুল কায়্যিম ১৯ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই 'আরবী ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষকদের মধ্যে কাজী সোলায়মান ইবন হামযা (মৃত্যু ৭১১ হি., ১৩১১ খৃ.)[৩৯] এবং শায়খ আবু বাকর ইবন 'আব্দুদ দায়্যিম (মৃত্যু ৭১৮ হি., ১৩২৮ খৃ.)[৪০] ছিলেন অন্যতম। (চলবে)

---

৩৪. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কী'ঈন, খ. ১, ভূমিকা, পৃ. (ص)।
৩৫. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ১, মুকাদ্দামা, পৃ. (ز)।
৩৬. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন এর মুকাদ্দামায় নামটি শিহাব আন নাবলুসী আল্ 'আবির বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃ. (ق)
৩৯. বাকর ইবন 'আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
৪০. The Encyclopaedia of Islam, vol 3, p. 821

কৃত্রিম সংকট তৈরির ক্ষতিকর প্রভাব : ইসলামের আলোকে পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

ভূমিকা

কৃত্রিম সংকট (Artificial Crisis) বলতে বোঝায় ইচ্ছাকৃতভাবে বাজারে পণ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করা, সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া, মজুদদারি করা বা তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করা। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুতর নৈতিক ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য, জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বা গোষ্ঠী মুনাফার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে থাকে। এর ফলে সাধারণ মানুষ ন্যায্য দামে পণ্য কিনতে ব্যর্থ হয়, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায় এবং সমাজে চরম বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে অন্যের ক্ষতি করা, প্রতারণা করা এবং বাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.) বাজারে মজুদদারি ও ধোঁকাবাজিকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। তাই কৃত্রিম সংকট শুধু অর্থনৈতিক অপরাধ নয়, বরং এটি একটি নৈতিক ও ধর্মীয় অপরাধ হিসেবেও বিবেচিত। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের দৃষ্টিতে কৃত্রিম সংকটের ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সমাজে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়। নিম্নে কৃত্রিম সংকট তৈরির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. মজুতদারি (ইহতিকার) সরাসরি গুনাহ ও কৃত্রিম সংকটের মূল কারণ

মজুতদারি বা ইহতিকার হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যবসায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য বাজারে সরবরাহ না করে গুদামজাত করে রাখে, যাতে বাজারে সংকট তৈরি হয় এবং পরে উচ্চ দামে বিক্রি করা যায়। এটি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির সবচেয়ে প্রধান মাধ্যম। ইসলামে ব্যবসার উদ্দেশ্য কেবল লাভ নয়, বরং ন্যায় ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। যখন কেউ মানুষের প্রয়োজনকে পুঁজি করে সংকট সৃষ্টি করে, তখন তা সরাসরি জুলুমে পরিণত হয়। ফকীহগণ বলেন, বিশেষ করে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ইহতিকার আরও গুরুতর অপরাধ। এই প্রক্রিয়ায় বাজারের স্বাভাবিক চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ

মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম এটিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

"যে মজুতদারি করে, সে গুনাহগার।" মুসলিম, হাদীস নং-১৬০৫

২. খাদ্যপণ্য মজুত করে সংকট সৃষ্টি সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ

খাদ্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজন হওয়ায় খাদ্যপণ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা অন্য যেকোনো পণ্যের তুলনায় অধিক ভয়াবহ। যখন ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে বাজারে সরবরাহ কমিয়ে দেয়, তখন সরাসরি মানুষের জীবনযাত্রা হুমকির মুখে পড়ে। এতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সমাজে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়। ইসলামে খাদ্য সহজলভ্য রাখা একটি সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। তাই খাদ্য মজুত করে মূল্য বৃদ্ধি করা শুধু অর্থনৈতিক অপরাধ নয়, বরং মানবিকতার বিরুদ্ধেও জঘন্যতম অপরাধ। ফকীহগণ খাদ্যপণ্যে মজুতকারীকে বিশেষভাবে হারাম বলেছেন। এটি সমাজে অস্থিরতা ও অন্যায়ের জন্ম দেয়। ফলে খাদ্যসংকট সৃষ্টি করা ইসলামি দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"গুনাহগার ছাড়া কেউ মজুতদারি করে না।"- মুসলিম, হাদীস নং-১৬০৫

৩. বাজারে পৌঁছার আগেই পণ্য কিনে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ

বাজারে পণ্য পৌঁছার আগেই বানিজ্য কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করে তা কিনে নেওয়া (তালাক্কি রুকবান) একটি কৌশল, যার মাধ্যমে ব্যবসায়ী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এতে বাজারে প্রকৃত প্রতিযোগিতা ব্যাহত হয় এবং মূল্য স্বাভাবিকভাবে নির্ধারিত হতে পারে না। এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা প্রকৃত বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, ফলে তাকে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তীতে সেই পণ্য বেশি দামে বিক্রি করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। ইসলাম এই ধরনের লেনদেন নিষিদ্ধ করে বাজারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চায়। এটি প্রমাণ করে যে, সরবরাহের প্রাকৃতিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে এই পদ্ধতি কৃত্রিম সংকট তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ.

"রাসূল (সা) বাজারে আসার আগেই বানিজ্য কাফিলার সাথে মিলিত হয়ে পণ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" বুখারী, হাদীস নং-২১৬২

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى تُهْبَطَ إِلَى السُّوقِ

"পণ্য বাজারে পৌঁছার আগে তা গ্রহণ করো না।" মুসলিম, হাদীস নং-১৫১৯

৪. মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য বৃদ্ধি নিষিদ্ধ

বাজারে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে প্রবেশ করে পণ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া এবং পরে ইচ্ছামতো মূল্য নির্ধারণ করা কৃত্রিম সংকট তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এতে প্রকৃত বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে বাজারে তথ্যের অসমতা তৈরি হয় এবং সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলাম বাজারকে স্বচ্ছ ও সরাসরি লেনদেনভিত্তিক রাখতে চায়। যখন কেউ মধ্যস্থতার মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তা ন্যায্য প্রতিযোগিতা নষ্ট করে। এই ধরনের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ তৈরি করে। তাই ইসলাম এই ধরণের হস্তক্ষেপকে নিষিদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

"রাসূলুল্লাহ (সা) শহরের লোক গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" বুখারী, হাদীস নং-২১৫৮

৫. বাজারে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি বা দালালী করা (নাজাশ) সম্পূর্ণ হারাম

নাজাশ হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ক্রয়ের ইচ্ছা ছাড়াই কেউ দাম বাড়িয়ে বলে, যাতে অন্য ক্রেতারা বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়। এটি বাজারে মিথ্যা চাহিদা তৈরি করে এবং মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কৃত্রিম সংকট তৈরির ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার। ইসলাম বাজারে সত্যতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চায়, তাই এই ধরনের প্রতারণা নিষিদ্ধ করেছে। এতে ক্রেতারা প্রকৃত বাজার পরিস্থিতি বুঝতে পারে না। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়। এটি সরাসরি অর্থনৈতিক প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ

"নবী (সা) দালালী (কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো) নিষেধ করেছেন।" বুখারী, হাদীস নং-২১৪২

৬. অন্যের বিক্রির উপর বিক্রি করে বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি নিষিদ্ধ

একজন বিক্রেতার লেনদেনের উপর অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করে নিজের বিক্রি দাঁড় করানো বাজারে অস্থিরতা তৈরি করে। এতে প্রতিযোগিতা নষ্ট হয় এবং দাম কৃত্রিমভাবে ওঠানামা করে। এটি ধীরে ধীরে বাজারে অনিয়ম ও সংকটের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইসলাম ন্যায়ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সমর্থন করে, কিন্তু হস্তক্ষেপমূলক প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ করে। এই ধরনের আচরণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে এবং বাজার ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। ফলে এটি কৃত্রিম সংকটের পরোক্ষ একটি মাধ্যম। ইসলাম এ ধরনের হস্তক্ষেপকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

"তোমরা একে অপরের বিক্রির উপর বিক্রি করো না।" মুসলিম, হাদীস-১৪১২

৭. সরবরাহ চেইন নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি নিষিদ্ধ

সরবরাহ চেইনের প্রাকৃতিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করলে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি হয়। কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পণ্য বাজারে পৌঁছানোর আগেই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, ফলে প্রকৃত বাজারদর গোপন থাকে। এতে সাধারণ মানুষ সঠিক মূল্য সম্পর্কে ধারণা পায় না এবং বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়। ইসলাম বাজারকে স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। বাজারে তথ্য গোপন করা বা আগাম নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ন্যায্য বাণিজ্যের পরিপন্থী। এই ধরনের কাজ ধীরে ধীরে সিন্ডিকেট তৈরি করে, যা সংকটের মূল কারণ। তাই ইসলাম এই ধরনের হস্তক্ষেপকে নিষিদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ دَخَلَ فِي سِعْرِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ.

"যে মুসলমানদের দামে হস্তক্ষেপ করে তা বাড়ানোর জন্য, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেন।" মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৫৫৫৩

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ

"তোমরা (বাজারে আসার আগে) পণ্য গ্রহণ করতে যেও না।" বুখারী, হাদীস নং-২১৬২

৮. বাজারে প্রতারণা (গারার) নিষিদ্ধ

গারার অর্থ হলো লেনদেনে প্রতারণা করা, যার ফলে এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতারণা দু'ভাবে করা হয়ে থাকে। এক. পর্যাপ্ত পণ্য মজুত থাকা সত্তেও পণ্য নাই বা সরবরাহ নেই বলে প্রকৃত তথ্য গোপন করে জনসাধারণকে প্রতারিত করা এবং মূল্য বৃদ্ধি করা। দুই. পণ্যের দোষ ত্রুটি গোপন রেখে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা। প্রথম অবস্থায় প্রতারণার মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে জনসাধরণকে বেশি দামে কিনতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় অবস্থায় দোষযুক্ত বা নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে বিক্রি করে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করা হয়। এ ধরনের প্রতারণমূলক বিক্রিকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"রাসূল সা. অস্পষ্ট/প্রতারণামূলক লেনদেন নিষেধ করেছেন।" মুসলিম, হাদীস-১৫১৩

৯. জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করে ব্যবসা করা হারাম

ইসলামে ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য হলো ন্যায় ও উপকারিতা, ক্ষতি নয়। যখন কেউ নিজের লাভের জন্য জনগণের ক্ষতি করে, তখন তা শরীয়তের মূলনীতির বিরোধী হয়। কৃত্রিম সংকট সরাসরি জনগণের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়। কেননা, এতে পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। দরিদ্র মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলাম এমন ব্যবসাকে বৈধ মনে করে না, যা সমাজে ক্ষতি সৃষ্টি করে। বরং ক্ষতি প্রতিরোধ করা

ইসলামি অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তাই জনস্বার্থবিরোধী ব্যবসা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"ক্ষতি করা যাবে না এবং প্রতিকূল ক্ষতিও করা যাবে না।" সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২৩৪০

১০. বাজারে সত্য গোপন করলে বরকত নষ্ট হয়

বাজারে সত্য গোপন করা বা মিথ্যা তথ্য প্রচার করলে ব্যবসার বরকত নষ্ট হয়ে যায়। কৃত্রিম সংকট তৈরির জন্য সাধারণত পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করা হয়। এতে ক্রেতারা বিভ্রান্ত হয় এবং ন্যায্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ইসলাম ব্যবসায় সততা ও স্বচ্ছতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সত্য গোপন করলে শুধু দুনিয়ার ক্ষতি নয়, আধ্যাত্মিক বরকতও উঠে যায়। ফলে দীর্ঘমেয়াদে সেই ব্যবসা টিকে না। তাই স্বচ্ছতা বজায় রাখা অপরিহার্য। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

"যদি তারা সত্য বলে ও স্পষ্ট করে, তাদের ব্যবসায় বরকত দেওয়া হয়।" বুখারী, হাদীস নং-২০৭৯

উপসংহার : গবেষণার আলোকে দেখা যায় যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি একটি বহুমাত্রিক ক্ষতিকর প্রক্রিয়া, যা অর্থনীতি, সমাজ ও নৈতিকতা তিনটি ক্ষেত্রেই গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাজারে কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি হলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামাজিক বৈষম্য আরও তীব্র হয়। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতা, অসন্তোষ এবং আস্থাহীনতা বৃদ্ধি পায়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও জুলুম হিসেবে গণ্য। কারণ ইসলাম ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন, স্বচ্ছতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দেয়। কুরআনে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং হাদিসে বাজারে মজুদদারিকে গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং বলা যায়, কৃত্রিম সংকট প্রতিরোধে আইনি কাঠামোর পাশাপাশি নৈতিক ও ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাকওয়া ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হলে এই সমস্যা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। একটি ন্যায়ভিত্তিক ও স্থিতিশীল অর্থনীতি গঠনে ইসলামী মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ■

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

৪৮ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

ইরানে ইসরায়েল-মার্কিন যৌথ হামলা

মীযানুল করীম

কিছুদিন আগে ইরানের উপর মার্কিন ও ইসরায়েল যৌথ হামলা চালিয়েছিল। এবার মার্চ মাস পুরোটাই হামলা চলে। মার্চের ১ তারিখে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি নিহত হন। তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ, নাতী, নিরাপত্তা উপদেষ্টা, ইরানের সেনা প্রধান প্রমুখ নিহত হন। সাবেক প্রেসিডেন্ট আহম্মদীনেজাদ নিহত হন দুইদিন পর। ইরানের সাথে মার্কিন দ্বন্দ্ব পুরানো। খোমেনীর ইসলামী বিপ্লবের পরে ইরানী ছাত্ররা মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও করে রাখে। সেই থেকে বিরোধের উৎপত্তি। এর আগে ইরান মার্কিনপন্থী দেশ ছিল। ১৯৫৩ সালে ডাক্তার মোছাদ্দেককে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় মার্কিন ইন্ধনে। ইরানের শাহ ছিলেন মার্কিন খেলার পুতুল। মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও করার ফলে ইরানের যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হয় এবং দুই দেশের বিরোধ চরমে উঠে। ইরানের পারমাণবিক শক্তি নিয়ে মার্কিন সন্দেহ প্রবলতর হয়ে উঠে।

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় খামেনি নিহত

মার্কিন ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ৩৭ বছর ধরে নেতৃত্ব করা ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেনি নিহত হয়েছেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুতে ইরান জুড়ে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক এবং সাত দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

তেহরান প্রতিশোধের ঘোষণা দিয়েছে, হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছে, আর ইসরায়েলে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এটি শুধু নেতৃত্ব পরিবর্তনের ঘটনা নয় বরং মধ্যপ্রাচ্যের শক্তির ভারসাম্য বদলে দেয়ার মতো সঙ্কট।

আবেগঘন শোক, কঠোর নিরাপত্তা

খামেনির মৃত্যুসংবাদ পাঠ করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের এক উপস্থাপক সরাসরি সম্প্রচারে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই দৃশ্য ইরানজুড়ে গভীর আবেগের সঞ্চার করে।

একই সময়ে রাজধানী তেহরানসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার করে আইআরজিসি। সামরিক খাঁটি, পারমাণবিক স্থাপনা ও সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়। নিরাপত্তা সূত্রগুলো বলছে, সম্ভাব্য নাশকতা বা বিদেশী হামলা ঠেকাতে "ফুল মোবিলাইজেশন" অবস্থায় রয়েছে বাহিনী।

সংবিধান অনুযায়ী কিভাবে নেতৃত্ব বদল হবে

খামেনির মৃত্যুতে ইরান নেতৃত্বশূন্য হয় না। দেশটির সংবিধানে উত্তরাধিকার প্রক্রিয়া স্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত। নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করবে বিশেষজ্ঞ পরিষদ। ৮৮ সদস্যের একটি ধর্মীয় পরিষদ। ভোটে আট বছরের জন্য তারা নির্বাচিত হন। এই পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তে সর্বোচ্চ নেতা ঠিক হয়।

সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুতে অস্থায়ীভাবে একটি 'লিডারশিপ কাউন্সিল' দায়িত্ব নেয়। প্রেসিডেন্ট প্রধান বিচারপতি এবং গার্ডিয়ান কাউন্সিলের একজন জুরিস্ট। এই কাউন্সিল দ্রুত নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। আইনজ্ঞ হিসেবে আলিরেজা আরাফির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সর্বোচ্চ নেতার ক্ষমতা বণ্টন

ইরানে প্রেসিডেন্ট থাকলেও চূড়ান্ত ক্ষমতা সর্বোচ্চ নেতার হাতে। তিনি– সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, যুদ্ধ বা শান্তি ঘোষণা করেন, বিচার বিভাগ, রাষ্ট্রীয় মিডিয়া ও সামরিক কমান্ডার নিয়োগ দেন, প্রেসিডেন্ট অনুমোদন বা অপসারণ করতে পারেন এবং পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতির শেষ সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ নতুন নেতা মানেই ইরানের নীতির নতুন দিকনির্দেশনা।

আইন বলছে, ধর্মীয় পরিষদ নির্বাচন করবে, কিন্তু বাস্তবে আইআরজিসির সমর্থন ছাড়া কেউ ক্ষমতায় টিকতে পারে না। বিশ্লেষকদের ভাষায়, 'আইনি বৈধতা দেয় আলেমরা, বাস্তব ক্ষমতা দেয় বন্দুক।'

ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া ধর্মীয় হলেও ফালাফল নির্ভর করতে পারে রাজনৈতিক সমীকরণের উপর।

প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি ও পাল্টা হামলা

আইআরজিসি বিবৃতিতে জানিয়েছে, সবচেয়ে বিধ্বংসী আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা হবে। অঞ্চলজুড়ে মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে হুমকি দেয়া হয়েছে। ইসরায়েলের বেইত শেমেশ এলাকায় ইরানি ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে নিহত ও বহু আহত হওয়ার খবর গণমাধ্যমে এসেছে।

হরমুজ প্রণালী বন্ধ

তেহরান ঘোষণা দিয়েছে, কৌশলগত হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ। এই রুট দিয়েই বিশ্বের বড় অংশের জ্বালানি পরিবহণ হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

ওয়াশিংটন ও তেলআবিব আনুষ্ঠানিকভাবে হামলার দায় স্বীকার না করলে ও মার্কিন রাজনৈতিক মহলে ইরানকে "কৌশলগত হুমকি" হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। আঞ্চলিক মিত্ররা সতর্ক অবস্থানে। উপসাগরীয় দেশগুলো তেল সরবরাহ ও সমুদ্রপথ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

খামেনি হত্যার পর পাল্টা হামলা, সঙ্ঘাতের বিস্তার

মার্কিন ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেনী নিহত হওয়ার পর পরিস্থিত দ্রুত আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নিচ্ছে। তেহরান ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে, একই সাথে প্রতিশোধের অঙ্গীকার করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে কূটনৈতিক সর্তকতা, সামরিক শক্তি মোতায়েন এবং জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তা- সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

রাশিয়ার সমবেদনা

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন খামিনির হত্যাকান্ডে সমবেদনা জানিয়ে বলেছেন, এটি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।

যুদ্ধে মিত্রদের পাশে পাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র

ইরানে মার্কিন ও ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে মিত্র দেশগুলোকে এ যুদ্ধে যুক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধের ১৭তম দিনেও কোন দেশ এ যুদ্ধে যোগ দেয়নি। সে ক্ষোভ থেকেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাজ্যসহ মিত্রদেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক সহায়তা না দিলে সামরিক জোট ন্যাটোর ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। যদিও তিনি আশা প্রকাশ করেন, হরমুজ প্রণালী স্বাভাবিক করতে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সকে পাশে পাবে ওয়াশিংটন।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। জবাবে ইসরায়েল ও মার্কিন ঘাঁটি এবং উপসাগরীয় দেশগুলোতে স্থাপনাগুলোয় পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। আশপাশের অন্তত ১৪টি দেশে যুদ্ধের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তেহরান কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ করে দেওয়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি নিয়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের জ্বালানির ২০ শতাংশ সরবরাহ করা হয়। জ্বালানি নিয়ে এ পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের উপর একধরনের চাপ তৈরি করেছে।

তারপরও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। ইরানের তেহরান, তাবরিজ ও শিরাজে ব্যাপক হামলা হয়েছে। ইরান ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালিয়েছে।

এছ ছাড়া কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইরাকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর পাওয়া গেছে।

ইরান যুদ্ধবিরতির জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে- মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ দাবি আবারও প্রত্যাখান করে ইরান বলেছে, যত দিন প্রয়োজন তত দিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তারা প্রস্তুত।

মিত্রদের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ইরানে মার্কিন-ইসরালেয় হামলা শুরুর পর জ্বালানি তেলের দাম ৪০ শতাংশ বেড়ে প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সেই চাপ থেকে যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করতে চাইছে। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওই প্রণালী দিয়ে জ্বালানিবাহী জাহাজ ও ট্যাংক চলাচল নিশ্চিত করতে মিত্রদের সেখানে যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর আহবান জানান।

তাঁর প্রত্যাশা মিত্রদেশ ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করতে সহায়তা করবে। কোনো সাড়া না পেয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাজ্যসহ মিত্রদেশগুলো সহায়তা না দিলে সামরিক জোট ন্যাটোর ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, 'যারা এই প্রণালী (হরমুজ) থেকে উপকৃত হচ্ছে, তাদের উচিত, সেখানে যাতে খারাপ কিছু না ঘটে, সে জন্য সহায়তা করা করা।

কেনেডি সেন্টারের বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠকের আগে প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'কিছু দেশ রয়েছে, যাদের আমরা সাহায্য করেছি এবং ভয়ংকর ঝুঁকি থেকে রক্ষা করেছি। তারা সহায়তায় অতটা আগ্রহী না। উৎসাহের মাত্রা আমার কাছে ওরুত্বপূর্ণ।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, তিনি এই বিষয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া জুতসই নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি মনে করি, তিনি (ম্যাক্রো) সাহায্য করবেন।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের আশা, যুক্তরাজও হরমুজ মিশনে যুক্ত থাকবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাবেক রাষ্ট্রদূত জেমস মোরান বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের কোনো বৈধতা নেই- এ বিষয়ে ইউরোপজুড়ে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে।

মোরান আল জাজিরাকে বলেন, হরমুজ প্রণালীর বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউরোপকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে। একই সঙ্গে ইউরোপের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী (রাশিয়া) বিশ্ব বাজারে জ্বালানির উচ্চ মূল্যের কারণে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাচ্ছে।

ইউরোপ যে ওয়াশিংটনের প্রত্যাশামতো হরমুজ মিশনে যুক্ত হচ্ছে না, তা স্পষ্ট করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কাজা কালাম। ব্রাসেলসে জোটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলেন, ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মধ্যপ্রাচ্যে নৌ-মিশন শক্তিশালী করার 'সুস্পষ্ট ইচ্ছা' প্রকাশ করেছেন। হরমুজ প্রণালী পর্যন্ত এ পরিধি বাড়ানোর কোনো আগ্রহ তাঁদের নেই।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র- ইসরায়েলের হামলা 'ন্যাটোর-যুদ্ধ' নয় উল্লেখ করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ, র্মৎস।

৩২ দেশের জোট ন্যাটোর সদস্য ইতালি, স্পেন, পোল্যান্ড ও গ্রিস হরমুজ প্রণালীতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে না বলে জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত মিত্র অস্ট্রেলিয়া ও জাপান বলেছে, তারাও হরমুজ প্রণালীতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে না। ন্যাটোর আরেক কৌশলগত অংশীদার দক্ষিণ কোরিয়া বলেছে, তারা আহ্বান বিবেচনা করে দেখছে। দেশটিতে বিক্ষোভ হচ্ছে।

হরমুজ প্রণালীর বিষয়ে আগের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগছি। সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালী খোলা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মিত্রদের জন্য তা বন্ধ।

পাল্টাপাল্টি হামলা, যুদ্ধ বন্ধ চায় না যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলের হামলায় তেহরানে রেড ক্রিসেন্টের একটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইরানের 'মেহর নিউজ' জানিয়েছে, তেহরানের আকাশ থেকে কিছু ক্ষতিকর নিক্ষিপ্ত বস্তু, ধ্বংস করেছে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ইরানের ছেলেদের একটি স্কুলেও হামলার কথা জানা গেছে। যুদ্ধের শুরুর দিকে দেশটির মেয়েদের একটি স্কুলে হামলায় প্রায় ১৭০ জন নিহত হয়েছিল।

ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ বন্ধে চুক্তি করতে প্রস্তুত নয় বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ইরানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলে পরিচিতি খারাগ দ্বীপে আরও হামলা চালানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। এনবিসি নিউজকে টেলিফোনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। ইসরায়েল বলছে, ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা

রয়েছে। আর ইরান আশঙ্কা করছে, যুক্তরাষ্ট্র ৯/১১ এর মতো ঘটনা ঘটিয়ে তার দায় তেহরানের উপর চাপানোর ষড়যন্ত্র করছে।

যুদ্ধের ১৬তম দিনেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালিয়েছে। ইরানও পাল্টা হামলা চালিয়েছে। কুয়েত, রাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে হামলার খবর পাওয়া গেছে। ইরানের দাবি, তারা অঞ্চলটির যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ঘাঁটি এবং ইসরায়েলের পুলিশ সদর দপ্তর ও স্যাটেলাইট যোগাযোগ কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে। লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৮৫০-এ দাঁড়িয়েছে।

শর্ত হতে হবে 'খুবই সুর্নিদিষ্ট'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এনবিসি নিউজকে বলেন, 'আমি মনে করি, তেহরান আলোচনায় বসতে আগ্রহী। তারা (যুদ্ধ বন্ধে) একটি চুক্তি করতে চায়, আমি তা চাই না। কারণ শর্তগুলো যথেষ্ট ভালো নয়। ওয়াশিংটন আরও ভালো শর্তের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।' তিনি বলেন, শর্ত হতে হবে 'খুবই সুনির্দিষ্ট।' শর্তের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ শর্তের বিষয়ে আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই না।'

ইরানের খারাগ দ্বীপে আরও হামলা চালানোর ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'স্রেফ মজার' জন্য সেখানে আরও হামলা চালানো হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র খারাগ দ্বীপের ৯০টির বেশি সামরিক স্থাপনায় হামলা চালায়। এই দ্বীপ থেকে ইরান তার তেল রপ্তানির ৯০ শতাংশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠায়।

হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সেখানে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জাপানসহ বিভিন্ন মিত্রদেশ ও চীন সেখানে যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু অধিকাংশ দেশ ইঙ্গিত দিয়েছে, এ মুহূর্তে তাদের সে রকম কোনো পরিকল্পনা নেই।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরানের দিক থেকে বারবার বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সংশ্লিষ্ট কোনো ট্যাংকার বা জাহাজ হরমুজ প্রণালী পার হতে পারবে না। দেশটির নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনিও বিশ্বের জ্বালানি প্রবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথটি বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন।

হামলা শুরুর পর থেকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে অন্তত ১৬টি জাহাজ ও ট্যাংকারে হামলা হয়েছে। তবে ভারত ও তুরস্কের কয়েকটি জাহাজ ইরানের অনুমতি নিয়ে প্রণালীটি পার হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত যুদ্ধের আশঙ্কা

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সঙ্ঘাত নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক হামলা এবং ইরানের পাল্টা প্রতিক্রিয়া পুরো অঞ্চলেকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। এই সঙ্ঘাত এখন কেবল দুই দেশের সীমিত দ্বন্দ্ব নয়; বরং তা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, জ্বালানি বাজার এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

সাম্প্রতিক হামলার মধ্যে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও সামরিক কেন্দ্র ইসফাহান প্রদেশে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে অন্তত ১৫ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ইরান

দাবি করছে, তারা ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে একাধিক দফায় হামলা চালিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে এ সঙ্ঘাত দ্রুত একটি বহুমাত্রিক আঞ্চলিক সঙ্কটে রূপ নিচ্ছে।

ইসফাহানে হামলা ও বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি

ইরানের ইসফাহান প্রদেশ দেশটির শিল্প ও সামরিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সাম্প্রতিক হামলায় বিভিন্ন কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করা হয়েছে। যদিও হামলার ব্যাখ্যায় ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র বলছে, এটি সামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে তবুও বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য বলে দাবি করছে তেহরান। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, হামলায় অন্তত ১৫৩টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নিহতের মধ্যে ২০০ শিশু ও শতাধিক নারী রয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইসফাহানে হামলা শুধু সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করেনি; এটি ইরানের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার উপরও আঘাত হেনেছে। শহরের সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এবং ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারি উদ্যোগ সীমিত বলে অভিযোগ উঠেছে।

আইআরজিসির নতুন হামলার ঘোষণাঃ

ইরানের ইসলামিক বেভুল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছে, তারা 'অপারেশন টু প্রমিস-৪' সামরিক অভিযানের ৫৩তম ধাপ শুরু করেছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই অভিযানে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ফাতাহ ও কদর' এবং আত্মঘাতী ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাঁটি এবং ইসরায়েল-সম্পৃক্ত কমান্ড অবকাঠামো।

বিভিন্ন মার্কিন খাঁটিতে হামলার দাবি

আইআরজিসি জানিয়েছে, আগের ধাপগুলোতে তারা মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলের আল হাবিব খাঁটি, কুয়েতের আলি আল সালেম ও আরিফজান খাঁটি, বাহরাইনে মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের সদর দফতর এবং জর্দান ও কুয়েতের অন্যান্য সামরিক স্থাপনা। ইরানের দাবি, এসব ঘাঁটি থেকে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল।

প্রতিরোধ অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা

আইআরজিসি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান আরও জোরদার করা হবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং আক্রমণকারীরা শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে।' তাদের দাবি, শ্রীলঙ্কার উপকূলে একটি মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো হামলায় ইরানি নৌবাহিনীর জাহাজ ডেনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৮৪ নাবিক নিহত হন।

ইসরায়েলের পুলিশ সদর দফতর ও স্যাটেলাইট কেন্দ্রে হামলা

ইরান দাবি করছে, ইসরায়েলের পুলিশ সদর দফতর এবং একটি প্রতিরক্ষা স্যাটেলাইট যোগাযোগ কেন্দ্রের উপর ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'লাহাভ ৪৩৩' বিশেষ পুলিশ ইউনিট সদর দফতর এবং গিলাত স্যাটেলাইট যোগাযোগ কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়।

হরমুজ প্রণালী ও বৈশ্বিক অর্থনীতি

বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতি উপসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ। এই প্রণালীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বৈশ্বিক তেল বাজারে বড় ধরণের অস্থিরতা দেখা দেয়। যুক্তরাজ্যের জ্বালানি সচিব এড মির্লিব্যান্ড জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রণালী নিরাপদ রাখার বিকল্প খোঁজা হচ্ছে।

কাবু করা যাচ্ছে না ইরানকে

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে কেন্দ্র করে চলমান যুদ্ধ ক্রমেই বিস্তৃত আঞ্চলিক সঙ্ঘাতে রূপ নিচ্ছে। ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র যৌথবাহিনীর সর্বাত্মক তাণ্ডবেও কাবু করা যাচ্ছে না অদম্য ইরানকে। মধ্যপ্রাচ্যে সব শক্তি জড়ো করেও মুসলিম প্রজাতন্ত্রটিকে নত করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। টানা বিমান হামলার পরও প্রত্যুত্তরে ইসরায়েলসহ উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তেহরান। আরব দেশে মার্কিন লক্ষ্যবস্তু ঘিরে আক্রমণ করেছে দেশটি। আরব আমিরাতের বাসিন্দাদের আবুধাবি ও দুবাইয়ের বন্দর এলাকা খালি করার আহ্বান জানিয়েছে তেহরান। এর মধ্যে ইরানের তেল রফতানির বড় কেন্দ্র খারাগ দ্বীপে মার্কিন হামলা, ইসরায়েলের উপর ইরানিক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ, ইরাক ও উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থে অব্যাহত আক্রমণ এবং হরমুজ প্রণালীর কার্যত অচল হয়ে পড়া- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি নতুন এক বৈশ্বিক সঙ্কটের দিকে যাচ্ছে। জ্বালানি সরবরাহ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা- সব কিছুই এখন এই যুদ্ধের প্রভাবের মধ্যে চলে এসেছে।

কঠোর হামলার হুমকি, অনড় ইরান

ইরানে আরও কঠোর ও বিস্তৃত পরিসরে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি ইরানের আরও নেতাকে লক্ষ্যবস্তু করা ও দেশটির বিভিন্ন স্থাপনা পুরোপুরি গুড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

তবে ইরান কোনোভাবেই 'আত্মসমর্পন করবে না' বলে আবারও জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশ কিয়ান। ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে ইরান। তবে মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশে হামলার ঘটনায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি এতে বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের এসব দেশ থেকে ইরান আক্রান্ত না হলে পাল্টা হামলা চালাবে না তেহরান।

ইরানে মার্কিন-ইসরায়েল যৌথ হামলা চলছে। এ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলা কঠিন। কারণ, ইরানের পক্ষে চীন, রাশিয়া রয়েছে। আবার, আমেরিকা ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইরানকে সাহায্য করছে। আর, আমেরিকা ইসরাইলকে যথাসাধ্য সাহায্য করছে। আগেও আমেরিকা ইসরায়েলের জনক ও পালক রূপে কাজ করেছে। ইরান হরমুজ প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আরব দেশসমূহে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা চালাচ্ছে ইরান। ■

৫৬ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

প্রশ্ন-১ ঃ কারো উপর হাজ্জ ফরয হয় কিন্তু তিনি ফরয হজ্জ আদায় করতে পারছেননা বিধায় তিনি বদলী হজ্জ করাতে চান। প্রশ্ন হলো যিনি বদলী হজ্জ করবেন তিনি ইফরাদ, তামাত্তু' কিংবা কিরান কোনটা করবেন?

উত্তর ঃ বদলী হজ্জ যিনি করবেন তিনি ইফরাদ হজ্জ করবেন। তবে তিনি যার বদলী হজ্জ করবেন তার অনুমতি সাপেক্ষে হজ্জে তামাত্তু' কিংবা কিরান হজ্জও করতে পারেন। অবশ্য তিনি যদি তামাত্তু' কিংবা কিরান হজ্জ করেন, তাহলে দমে শুক্‌র বা কুরবানী তিনি নিজ খরচে করবেন। তবে যার বদলী হজ্জ করবেন, তিনি যদি সন্তুষ্ট চিত্তে দমে শুক্‌র বা কুরবানীর টাকা (বা খরচ) দিয়ে দেন, তাহলে সেটাও জায়েয হবে। আর বর্তমানে যারা বদলী হজ্জ করিয়ে থাকেন, তাদের পক্ষ থেইে সচরাচর তামাত্তু' কিরান হজ্জ এবং কুরবানী করার অনুমতি থাকে। অতএব, এজন্য আলাদাভাবে অনুমতির দরকার পড়েনা। তবুও অনুমতি নেয়া চাই এবং তা উত্তম হবে। ■

প্রশ্ন-২ ঃ কোরবানীর সাথে ছেলে-মেয়েদের আকিকা দেয়া যাবে কিনা? কুরবানীর সাথে ছেলে বা মেয়ের আকীকা সম্পন্ন করে থাকলে পরবর্তীতে ছাগল দিয়ে পুনরায় আকিকা করতে হবে কি?

হাবিবুর রহমান
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

উত্তরঃ কুরবানীর পশুতে (গরু, মহিষ ও উটে) কুরবানীর অংশের সাথে আকীকার হিসসা বা অংশ নেয়া কিংবা এধরনের একই পশুতে একাধিক আকীকার অংশ নেয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত ও ঐকমত্যপূর্ণ নয়। ইমাম আহমাদ ইবন্ হাম্বল (র)-সহ অনেকের মতে আকীকা পূর্ণ পশু দ্বারা করতে হবে। পশুর অংশ বা হিস্‌সা দ্বারা নয়। গরু মহিষ বা উটের অংশ বা হিস্‌সা দ্বারা আকীকা করার বিষয়টিও সরাসরি হাদীসে পাওয়া যায় না। যাদের মতে কুরবানীর পশুর সাথে আকীকার হিসসা নেয়া জায়েয সে মতে কুরবানীর পশুর সাথে আকীকা করার পর ছাগল দিয়ে পুনরায় আকীকা করার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যারা কুরবানীর পশুতে আকীকার হিসসা নিয়ে আকীকা করা সঠিক ও জায়েয মনে করেন না তাদের কাছে এমন প্রশ্ন আসাটা অসংগত নয়। কুরবানীর সাথে কুরবানীর গরু, মহিষ বা উটে আকীকার হিসসা নিয়ে আকীকা করা হলে আকীকার উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

كُلُّ غُلاَمٌ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، فِيْهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

প্রত্যেক নবজাতক তার আকীকার নিকট বন্ধক (দায়বদ্ধ) থাকে। (অর্থাৎ তার রোগ বালাই ও বিপদ আপদ দুর হওয়া এবং তার নিরাপত্তা আকীকার উপর নির্ভরশীল।) জন্মের সপ্তম দিনে (তার আকীকার) পশু জবাই করা হবে, ঐদিনেই তার নাম রাখা ও চুল কাটা হবে।[১]

---

১. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী; জামি' আত তিরমিযী; আবওয়াবুল আদাহী, অনুচ্ছেদ: ২৩, শিশুর জন্মের সপ্তম ..... দিনে আকীকা করা, হাদীস নং ১৪৬৪;

তিনি আরো বলেন:

مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى.

নবজাতকের পক্ষ থেকে আকীকা করা প্রয়োজন। অতএব, তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (পশু জবাই করো) এবং তার থেকে ময়লা (বা কষ্টদায়ক বস্তু যেমন চুল) দূর করো।[২]

অপর একটি হাদীসে এসেছে,

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِتَسْمِيَةِ أَلْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضَعِ الْأَذَى وَالْعَقُّ.

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখা, চুল কামানো ও আকীকা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةُ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪]

উপরোক্ত হাদীসসমূহে নবজাতকের আকীকা তার জন্মের সপ্তম দিনে করার কথা বলা হয়েছে এবং ঐ দিনেই তার নাম রাখা ও মাথার চুল কামিয়ে তার কষ্ট দূর করা ও তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কথা বলা হয়েছে। উপরন্তু বলা হযেছে নবজাতক আকীকার নিকট বন্ধক ও দায়বদ্ধ থাকে। তাকে এই দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে বিপদ আপদ, রোগ-বালাই প্রভৃতি থেকে নিরাপদ করা ও সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠার জন্য জন্মের সপ্তম দিনে, ঐ দিন না পারলে চৌদ্দতম কিংবা একুশতম দিনে পশু জবাই করে তার আকীকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এই দিনগুলিতে নবজাতকের আকীকা করা তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকের কর্তব্য এবং তাদের প্রতি নবজাতকের অধিকার। কিন্তু তা না করে আমাদের সমাজে দেখা যায়, এই দিনে কিংবা এই দিনগুলিতে পশু জবাই করে আকীকা করার পরিবর্তে দীর্ঘদিন পর কুরবানীর সময় কুরবানীর পশুতে একটা অংশ বা একটা ভাগ নিয়ে আকীকা করার প্রচলন গড়ে উঠেছে।

কুরবানীর দিন যদি কোনো নবজাতকের সপ্তম দিন হয় তাহলে ঐদিন তার আকীকা করা হলে হাদীস মুতাবিক আমল করা হবে এবং তা সুন্নাত বা মুস্তাহাব হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরূপ হওয়া তো সচরাচর নয়, এমনকি শিশুর চৌদ্দ ও একুশতম দিনে কুরবানীর দিন হওয়াও সচরাচর নয়। এছাড়া কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ নিয়ে আকীকা করার বিষয়টিও ইমাম, ফকীহ ও আলেমগণের সর্বসম্মত ও ঐকমত্যপূর্ণ বিষয় নয়। বরং এটি একটি মতবিরোধপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ কারো কারো মতে তা জায়েয হলেও অনেকের মতে জায়েজ নয়। উপরন্তু আমাদের সমাজে কুরবানীর সাথে যাদের আকীকা করা হয়, দেখা যায় তাদের অধিকাংশেরই আকীকা জন্মের সাত, চৌদ্দ কিংবা একুশতম দিনে হয় না বরং কারো ছয় মাস, নয় মাস, কারো এক বছর, কারো দু' বছর, কারো আরো বেশী বয়সে করা হয়ে থাকে। যদিও কোনো মাযহাব

---

২. জামি' আত তিরমিযী; প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: ১৬, হাদীস নং-১৪৫৭;

৩. জামি' আত তিরমিযী; আবওয়াবুল আদাব, অনুচ্ছেদ: ৬৩, হাদীস নং-২৭৬৯

৪. জামি' আত তিরমিযী; আবওয়াবুল আদাহী, অনুচ্ছেদ: হাদীস নং- ১৪৫৫;

মতে এতে আকীকা হয়ে যাবে। কিন্তু এটা হয়তবা তাদের কাছেও কাঙ্ক্ষিত নয়, কারণ এতে যেমন হাদীস মুতাবিক আমল করা হয় না, (অর্থাৎ শিশুর জন্মের সপ্তমদিনে পশু জবাই করা, ঐদিনে তার নাম রাখা, চুল কাটা প্রভৃতি) তেমনি আকীকার উদ্দ্যেশ্যর (অর্থাৎ নবজাতকের রোগ বালাই, আপদ-বিদ দূর হওয়া, সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠা ও নিরাপত্তা লাভ করা প্রভৃতির) প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। পক্ষান্তরে শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে, তা সম্ভব না হলে চৌদ্দ অথবা একুশতম দিনে আকীকা করা হলে হাদীস মুতাবিক আমল করা হয়, আকীকার উদ্দেশ্য যথা সময়ে ও যথাযথভাবে রক্ষা করা হয় এবং মতপার্থক্যের উর্ধে উঠে ইমাম, ফকীহ ও আলেমগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী আমল করা হয়। অতএব, নবজাতকের পিতা-মাতা কিংবা তার অভিভাবকের কর্তব্য হবে তার জন্মের সপ্তম দিনে ছেলে হলে দু'টি, অপারগতায় একটি একটি মেয়ে হলে একটি ছাগল, ভেড়া অথবা দুম্বা প্রভৃতি দিয়ে আকীকা করা, এদিনেই তার নাম রাখা ও মাথা মুন্ডন করে সম্ভব হলে চুলের ওজনে সোনা অথবা রূপা সাদকা করা। কেউ সপ্তম দিনে না পারলে চৌদ্দতম কিংবা একুশতম দিনে শিশুর আকীকা করবেন।

শিশু জন্মের ৮/১০ মাস আগেই তার আগমনের বিষয়টি পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ জানতে পারেন। সন্তানের আকীকা করার সদিচ্ছা থাকলে আকীকার প্রস্তুতির জন্য এসময়টা যথেষ্ট, বরং অনেক। এরপরও অযথা ও অহেতুক কুরবানীর সময়ের জন্য আকীকার বিষয়টি ফেলে রাখা ও সময়মত না করার কোনোই যৌক্তিকতা নেই।

প্রশ্ন-৩ ঃ সালাতে সাজদারত অবস্থায় দু'পা রাখার বিধান কি জানতে চাই?

মুহাম্মদ আবুল কালাম, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ (সালাতে সাজদারত অবস্থায় দু'পা কিভাবে রাখবে সে সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ.

আমের ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাত (হাতের তালু) মাটিতে রাখা এবং দু'পা খাড়া রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫]

অপর একটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ.

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায় না পেয়ে মাসজিদে তালাশ করে দেখি তিনি সাজদারত আছেন, তাঁর পা দু'খানা খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি দু'আ করছেন.....।[৬]

عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها فِي وَايَةٍ "اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ رَاصًّا عَقِبَيْهِ" (صحيح ابن خزيمة).

'আয়িশা (রা) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, (সাজদায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

৫. জামি আত তিরমিযী, অধ্যায়-২, আবওয়াবুস সালাত, অনুচ্ছেদ-৯২, সাজদার সময় যমিনে হাত রাখা এবং পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা।

৬. সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়-৩, সালাত শুরু করার অনুচ্ছেদসমূহ, অনুচ্ছেদ-১৫৩: রুকূ' ও সাজদায় দু'আ করা।

সাল্লামের দু'পায়ের গোড়ালী যুক্ত ছিলো।[৭] এ থেকে জানা যায় যে, সাজদায় পা দু'খানা আলাদাভাবে খাড়া থাকবে এবং দু'পায়ের গোড়ালী একত্রে মিলে থাকবে।

প্রশ্ন-৪ ঃ জনৈক নারী তাওয়াফে ইফাযা করেননি। ইতোমধ্যে তিনি ঋতুমতী হয়ে পড়েন। হজ্জ কাফেলাও চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তার জন্য কাফেলার বিলম্ব করা সম্ভব নয়। সুস্থ অর্থাৎ পবিত্র হয়ে তাওয়াফে ইফাযা করা পর্যন্ত সৌদি আরবে অবস্থান করাও তার একার পক্ষে সম্ভব নয় এবং দেশে গিয়ে পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফে ইফাযা করার জন্য আবার মক্কায় আসাও তার পক্ষে অসম্ভব। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

আবু আসলাম, সাতমাথা, বগুড়া

উত্তর ঃ তাওয়াফে ইফাযা বলা হয় হজ্জের মূল তাওয়াফকে। এ তাওয়াফ না করলে হজ্জই সম্পন্ন হয় না। আর হজ্জের এ তাওয়াফ না করেই জনৈক নারী ঋতুমতী হয়ে গেছেন। পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় অবস্থান করা অথবা দেশে গিয়ে পবিত্র হওয়ার পর পুনরায় মক্কায় এসে তাওয়াফ করা যদি উক্ত নারীর জন্য অসম্ভব হয় তাহলে তিনি নিম্নের দু'টি পন্থার যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন :

এক. তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা নিয়ে ঋতু বন্ধ করা গেলে বা ঋতু আসার আগে চিকিৎসা নিয়ে ঋতু বিলম্বিত করা গেলে সেটা করা যেতে পারে। আর যে মহিলাগণ ওমরায় যাবেন তারা মাসিকের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ যখন সুস্থ বা মাসিকমুক্ত থাকবেন তখন ওমরায় যাওয়ার সময় নির্ধারণ করতে পারেন।

দুই. লজ্জাস্থানে প্যাড বা কাপড় এমন ভাবে বেঁধে নিতে হবে যাতে মাসজিদে বা মাতাফে (তাওয়াফ করার জায়গায়) রক্ত না পড়ে। এটাই বিশুদ্ধ মত যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) পছন্দ করেছেন। (ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫৮৫)

প্রশ্ন-৫ ঃ কোন নারী বিদায়ী তাওয়াফ করার পূর্বে ঋতুমতী হয়ে পড়লে তার করণীয় কি?

সালমা আক্তার, কদমতলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর ঃ যদি তিনি তাওয়াফে ইফাযাসহ হজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে থাকেন, তারপরে ঋতুমতী হয়ে পড়েন তবে তার বিদায় তাওয়াফ রহিত হয়ে যাবে।

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أُمِرَ النَّاسُ أَن يَّكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ

লোকদের আদেশ দেয়া হয়েছে, কা'বা ঘরের তাওয়াফ যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয়। তবে বিষয়টি ঋতুমতীদের জন্য হালকা করে দেয়া হয়েছে। (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায় : হাজ্জ, অনুচ্ছেদ-১৪৫, হাদিস নং-১৭৫৫)

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন বলা হলো, উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (রা) ঋতুমতী হয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি তাওয়াফে ইফাযা বা হজ্জের তাওয়াফ করে ফেলেছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা বের হয়ে যাও।

---

৭. সাহীহ ইবন খুযাইমা, মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন এটিকে প্রধান্য দিয়েছেন। আশ শারহুল মুমতি' 'আলা যাদ আল মুসতাকনি' ৩.১২১-১২২

তিনি তাঁর জন্য বিদায়ী তাওয়াফকে রহিত করে দিলেন।

এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, কোন নারী যদি তাওয়াফে ইফাযাসহ হজ্জের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে থাকেন এবং শুধুমাত্র বিদায়ী তাওয়াফ বাকি থাকে তারপর তিনি ঋতুমতী হয়ে যান এমতাবস্থায় যে, তার সফর সঙ্গীগণ বিদায়ী তাওয়াফসহ হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে বিদায় নেয়ার পথে, তবে তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। (দেখুন ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫৮৩-৫৮৪)

প্রশ্ন-৬ ঃ ক. ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করলে তার হুকুম কি?

খ. যে ব্যক্তি বিমানে ভ্রমণ করে সে ব্যক্তি কিভাবে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে?

মুহাম্মদ শাজাহান, চান্দিনা, কুমিল্লা

উত্তর ঃ (ক) ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রমকারীর দু'টি অবস্থা হতে পারে :

১. সে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার নিয়্যাত করেছে। তাহলে সে ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো সে ফিরে গিয়ে মীকাত থেকে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধবে। যদি সে তা না করে (বরং যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধে) তাহলে সে ওয়াজিব পরিত্যাগ করলো। সুতরাং তখন তার জন্য পশু দ্বারা ফিদিয়া দেওয়া আবশ্যক হবে, যা মক্কায় যবেহ করে সেখানকার দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে।

২. সে যদি হজ্জ বা ওমরা করার নিয়্যাত ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞদের অভিমত এটাই, যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা করার নিয়্যাত করে না, তার জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাধা আবশ্যক নয়। কাজেই তার ওপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না।

(শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃ. ৫১৩)

উত্তর ঃ (খ)

১. সে ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্বে গোসল করে সাধারণত যে পোশাক পরে সেই পোশাক পড়বে অথবা সে ইচ্ছা করলে ইহরামের পোশাক পরিধান করবে।
২. বিমান যখন মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছবে, তখন সে ইহরামের পোশাক পরিধান করবে, যদি ইতিপূর্বে তা পরিধান করে না থাকে।
৩. বিমান যখন মীকাত বরাবর পৌঁছবে তখন সে হজ্জ বা উমরার নিয়্যাত করবে এবং তালবিয়া পাঠ করবে।
৪. কেউ যদি গাফিলতি বা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় সতর্কতা স্বরূপ মীকাতে উপনীত হওয়ার আগেই ইহরাম বাধে তাহলে কোন দোষ নেই। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭)

প্রশ্ন-৭ ঃ উমরায় মাথামুণ্ডন করা বা চুল খাটো করার হুকুম কি? উভয়টির মধ্যে কোনটি উত্তম?

আবু হানিফ, সাভার

উত্তর ঃ উমরায় মাথা মুণ্ডানো বা চুল খাটো করা ওয়াজিব। উমরাকারীর জন্য মাথা মুণ্ডানো উত্তম। তবে সে যদি তামাত্তু' হজ্জকারী হয় অর্থাৎ প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা সমাপ্ত করে এবং পরে নির্দিষ্ট সময়ে নতুন করে ইহরাম বেধে হজ্জ সম্পন্ন করে, তাহলে

তার জন্য উমরার সময় চুল খাটো করা উত্তম। কেননা হজ্জের সময় সে মাথা মুণ্ডন করবে।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪৮-৫৪৯)

প্রশ্ন-৮ ঃ কোন ব্যক্তি যদি সকাল বেলা বিদায় তাওয়াফ সম্পন্ন করে অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে এবং আসরের পরে সফর শুরু করার নিয়্যাত করে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ সে ব্যক্তির জন্য পুনরায় বিদায়ী তাওয়াফ করা আবশ্যক হবে। কেননা নাবী (সা) বলেছেন, 'কেউ যেন চলে না যায় যতক্ষণ না তার শেষ কাজ হবে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা।' (প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৬৭)

প্রশ্ন-৯ ঃ এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করার পর তার মলদ্বার দিয়ে বায়ূ বের হলে তার তাওয়াফ কি নতুনভাবে শুরু করতে হবে নাকি তাওয়াফ চালিয়ে যাবে?

আশরাফুল ইসলাম, কাপাসিয়া, গাজীপুর

উত্তর ঃ যদি তাওয়াফ অবস্থায় কারো ওযু ভঙ্গ হয়- সেটি পায়ূ পথে বাতাস অথবা পেশাবের রাস্তায় পেশাব বা মনি বের হওয়ার কারণে হোক- তা দ্বারা তার তাওয়াফ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সে তাওয়াফ ত্যাগ করে চলে যাবে এবং পবিত্রতা অর্জন করে (ওযু করে) নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করবে। মাসয়ালাটিতে মতভেদ আছে। কিন্তু এটিই সহীহ মত।

তবে যদি একান্ত কোনো প্রয়োজনে তাওয়াফ বিচ্ছিন্ন করতে হয়, যেমন তাওয়াফরত অবস্থায় সালাতের ইকামাত হয়ে গেল, তাহলে তাকে তাওয়াফ স্থগিত করে সালাতে শরীক হতে হবে। অত:পর সালাম শেষে সেখান থেকেই পুনরায় তাওয়াফ শুরু করবে এবং অবশিষ্ট তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। হাজরে আসওয়াদে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে পুনরায় শুরু করতে হবে না। এটিই সঠিক মত। অবশ্য কারো কারো মতে তাকে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। (আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রাহমান ইবন বায, মাজমু'আ ফাতাওয়া, খ. ১০. পৃ. ১৬০)

প্রশ্ন-১০ ঃ কোনো ব্যক্তি উমরা শেষ করার পর তার ইহরামের কাপড়ে নাপাকী দেখতে পেল, তাহলে তার হুকুম কী?

রাশেদুল ইসলাম, দেবিদ্বার, কুমিল্লা

উত্তর ঃ যদি লোকেরা 'উমরার তাওয়াফ ও সা'ঈ করার পর ইহরামের কাপড়ে নাপাকী দেখতে পায়, তাহলে তার তাওয়াফ এবং উমরা শুদ্ধ হবে। কেননা যদি কেউ তার কাপড়ের নাপাকী সম্পর্কে অবগত না থাকে অথবা অবগত ছিল, কিন্তু ধুয়ে ফেলতে ভুলে গেছে, এমতাবস্থায় ঐ কাপড় দিয়ে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ হবে। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় তার তাওয়াফও সহীহ হবে। এর দলীল হলো, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর তখন তার দু'পায়ে জুতা ছিল। তিনি তার জুতা খুলে ফেললেন। তখন সাহাবীগণও তাদের জুতা খুলে ফেলল। সালাত শেষ করে নাবী (সা) বললেন, কি ব্যাপার? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমরা দেখলাম, আপনি জুতা খুলে ফেললেন, তাই আমরাও জুতা খুলে ফেললাম। তখন

তিনি বললেন, জিবরা'ঈল (আ) আমার কাছে এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, জুতা দু'টোতে নাপাকী রয়েছে। কিন্তু নাবী (সা) নুতনভাবে সে সালাত প্রথম থেকে আদায় করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, না জানা অবস্থায় অথবা ভুলে গিয়ে নাপাকি লাগা কাপড় পরে সালাত আদায় করলে তা সহীহ হবে। অনুরূপভাবে 'উমরাও সহীহ হবে। (মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উসাইমীন, ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃ. ৫৪৫-৫৪৬)

প্রশ্ন-১১ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কি সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে? তাছাড়া রমাযানের সিয়ামের কাযা কিভাবে আদায় করবো, জানালে উপকৃত হবো?

উত্তর ঃ যদি অসুস্থতা, সফর বা অন্য কোনো সংগত কারণে রমযানের রোযা বাদ পড়ে এবং রমযানের পরে অবকাশ পাওয়া সত্বেও যদি তা কাযা না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি রোযার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। বরং মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সে রোযাগুলো অবশ্যই কাজা করতে হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

"ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে বলল, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ তার উপর (রমযান) মাসের রোযা রয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, তোমার মায়ের উপর যদি কোনো ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? মহিলাটি বলল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ায় সবচেয়ে বেশি হকদার।"[৮]

মৃত ব্যক্তির রোযা কাযা করার পদ্ধতি কি হবে?

এ পদ্ধতি হলো, মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দু'বেলা খাদ্য খাওয়াবে অথবা ঐ পরিমাণ খাদ্য দরিদ্রকে দিয়ে দিবে তাহলেই তার রোযার কাজা হয়ে হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

"ইবন 'উমার (রা) সূত্রে নাবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যার উপর রমযান মাসের রোযা রয়েছে, সে যদি মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে যেন প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো হয়।"[৯]

তবে একটি হাদীছে বর্ণিত রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, অথবা অন্য কোনো নিকটাত্মীয় যদি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখে, তাহলেও সে দায়িত্বমুক্ত হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

---

৮. মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাবু কাজায়িস সিয়ামি 'আনিল মায়্যিত, হাদীছ নং ১১৪৮।

৯. তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাবু মা জাআ মিনাল কাফ্ফারাতি, হাদীছ নং ৭১৮; সহীহ ইবন খুযাইমা হাদীছ নং ২০৫৬।

"'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার উপর রোযার দায়িত্ব রয়েছে, সে ব্যক্তি মারা গেলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক রোযা রাখবে।"[১০]

ইমাম আবু হানিফা (রহ)সহ অধিকাংশ ইমামের মতে মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে থাকা প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দু'বেলা খাবার খাওয়াতে হবে। অথবা ঐ পরিমাণ খাদ্য দান করতে হবে। তারা বলেন, 'অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে' এর অর্থ হলো, দরিদ্রকে খাবার দিয়ে এর কাজা করবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর দু'টি মত পাওয়া যায়। তার প্রসিদ্ধতম মতটি হলো, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা জায়িযও নয়। তবে শাফি'ঈগণের একদল 'আলিমের মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা এবং খাদ্যা খাওয়ানো উভয়টি জায়িয।[১১]

যারা শরী'আত সংগত ওজর বা অপরাগতার কারণে রোযা ছেড়ে দেয়, অতঃপর সে অপরাগতা বিদ্যমান থাকতেই মৃত্যুবরণ করে এবং রোযা রাখতে সক্ষম হয় না বা অবকাশ পায় না, তাদের উপর রোযার কোনো দায়িত্ব থাকে না এবং তাদের রোযা কাজা করতে হবে না বা তাদের পক্ষ থেকে দরিদ্রকে খাদ্যও খাওয়াতে হবে না।[১২]

● ফতোয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

এখানে আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

১০. বুখারী, কিতাবুস সিয়াম, বাবু মাম মাতা ওয়া 'আলাইহি সাওমুন, হাদীছ নং ১৯৫২; মুসলিম, হাদীছ নং ১১৪৭; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৪০০।

১১. শারহি নাওয়াবী, খ. ৪, পৃ. ২৮২।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।